BLACK ICE
SOFTWARE INC.
Driver Demo

কাফেরের বন্ধুত্ব কেন নয়

মুহাম্মাদ খালিদ সাইফুল্লাহ রিয়াদ

সচেতন পাঠক মাত্রই অবগত আছেন যে বর্তমানে মুসলিম উম্মাহ এক ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী কাফের বেঈমানরা হায়েনার মত ঝাঁপিয়ে পড়েছে মুসলিম জাতির উপর। আমাদের এ বিপর্যয় বিনা কারণে আসেনি। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কুফরী শক্তির সাথে কোনপ্রকার বন্ধুত্ব স্থাপন করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। কিন্তু আমরা দয়াময় রবের সতর্কবাণী থেকে বিচ্যুত হয়ে খোদাদ্রোহী শক্তির সাথে অবাধে মেলামেশা করছি এবং নিজেরাও তাদের মত কুফর ও পাপকার্যে লিপ্ত হচ্ছি। আমাদের এ জাতীয় দুর্গতি থেকে মুক্তির জন্য ইসলামের শত্রুদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা একান্ত অপরিহার্য। এজন্য কাফের, মুশরিক, মুনাফিক, ইহুদী, খ্রীষ্টান ও পাপিষ্ঠদের সাথে সম্পর্ক রাখার অপকারিতা সম্পর্কে আল কুরআনের আলোকে বিচার-বিশ্লেষণ করা খুবই জরুরী। মনে রাখতে হবে, আল্লাহ পাকের আদেশ-নিষেধ আমাদের বিনা বাক্যব্যয়েই মেনে নেয়া ঈমানের দাবি। তথাপি তাৎপর্য ও কারণ বিশ্লেষণ করলে তা আমাদের বিশ্বাস ও সতর্কতা অবলম্বনে সহায়ক হবে। এছাড়া তা সন্দেহ-সংশয় নিরসনেও অনুপ্রেরণা যোগাবে।

পবিত্র কুরআনে যে সর্বদুরদর্শী আল্লাহ পাক আমাদের প্রতি ইহুদী-খ্রীস্টান তথা অমুসলিমদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন, তা বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে যথার্থ বলে প্রমাণিত হয়েছে। আল কুরআনে বলা হয়েছেঃ হে মুমিনগণ, তোমরা ইহুদী ও খ্রীস্টানদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ জালেমদের হেদায়েত করেন না। বস্তুতঃ যাদের অন্তরে রোগ রয়েছে, তাদেরকে আপনি দেখবেন, দৌড়ে গিয়ে তাদেরই মধ্যে প্রবেশ করে। তারা বলে, আমরা আশঙ্কা করি, পাছে না আমরা কোন দুর্ঘটনায় পতিত হই। অতএব, সেদিন দুরে নয়, যেদিন আল্লাহ তাআলা বিজয় প্রকাশ করবেন অথবা নিজের পক্ষ থেকে কোন নির্দেশ দেবেন- ফলে তারা স্বীয় গোপন মনোভাবের জন্যে অনুতপ্ত হবে। মুসলমানরা বলবে, এরাই কি সেসব লোক, যারা আল্লাহর নামে প্রতিজ্ঞা করত যে, আমরা তোমাদের সাথে আছি? তাদের কৃতকর্মসমুহ বিফল হয়ে গেছে, ফলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে আছে। হে মুমিনগণ, তোমাদের মধ্যে যে স্বীয় ধর্ম থেকে ফিরে যাবে, অচিরে আল্লাহ এমন এক সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন, যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন এবং তারা তাঁকে ভালবাসবে। তারা মুসলমানদের প্রতি বিনয়-নম্র হবে এবং কাফেরদের প্রতি কঠোর হবে। তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে এবং কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারে ভীত হবে না। এটি আল্লাহর অনুগ্রহ- তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন। আল্লাহ প্রাচুর্য দানকারী, মহাজ্ঞানী। তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ, তাঁর রাসুল এবং মুমিনবৃন্দ- যারা নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং বিনম্র। আর যারা আল্লাহ, তাঁর রাসুল এবং ঈমানদারদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তারাই আল্লাহর দল এবং তারাই বিজয়ী। হে মুমিনগণ, আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা তোমাদের ধর্মকে উপহাস ও খেলা মনে করে, তাদেরকে এবং অন্যান্য কাফেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। আল্লাহকে ভয় কর, যদি তোমরা ঈমানদার হও। আর যখন তোমরা নামাযের জন্য আহবান কর, তখন তারা একে উপহাস ও খেলা মনে করে। কারণ, তারা নির্বোধ।" (সুরা আল-মায়েদাহঃ ৫১-৫৮)

এখানে উদ্ধৃত প্রথম আয়াতের শুরুতে ইহুদী-খ্রীষ্টানদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করা হয়েছে। এরপর এ নিষেধাজ্ঞার কারণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, তারা নিজেরা পরস্পরের বন্ধু। অর্থাৎ, তারা তাদের যাবতীয় বন্ধুত্বকে নিজেদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখে। বিধর্মীদের মাঝে ধর্মীয় পার্থক্য, ক্ষমতার লড়াই ও গোত্রগত কলহ-বিবাদ থাকলেও ইসলাম ও মুসলমানদের ধ্বংসের ও তাদের ক্ষতি সাধনের ব্যাপারে তারা সবাই ঐক্যবদ্ধ। হাদীসে আছে, "সকল কাফের এক জাতি।" জাহেলী যুগে ইহুদী ও কাফের গোত্রসমুহ নিজেরা কেমন একে অপরের জানের দুশমন ছিল, তা আমাদের অজানা নয়। কিন্তু খন্দকের যুদ্ধে তারা সবাই মিলে বহুজাতিক বাহিনী গঠন করে ইসলামের টুটি চেপে ধরতে এগিয়ে আসে। সার্ব-ক্রোটরা নিজেদের মধ্যে জাতিগত শত্রুতা সত্ত্বেও মুসলিম নিধনের জন্য একজোট হয়েছিল। বসনিয়া ও কসোভো সংকটে পশ্চিমা খ্রীস্টানরা উপরে উপরে নির্যাতিত মুসলমানদের প্রতি সহানুভুতি প্রদর্শন করলেও বাস্তবে তারা সার্বীয় জালেমদের পক্ষেই কাজ করেছে। চেচনিয়ায় রাশিয়ার 'সন্ত্রাস দমনের' অধিকারকে পশ্চিমারা একবাক্যে স্বীকৃতি প্রদান করেছে। আর ইসরাইলের প্রতি মার্কিন আনুগত্য তো একেবারে শর্তহীন ও সলিড। পাক-ভারত দ্বন্দ্বে চীনারাও ভারতের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে। সাম্প্রতিক ইরাক আগ্রাসন প্রশ্নে ইহুদী-খ্রীস্টান পরাশক্তিবর্গের কেউ কেউ চক্ষুলজ্জার খাতিরে কিংবা কুকুরের মত মাংস নিয়ে কামড়াকামড়ির তাড়নায় প্রথম প্রথম বিরোধিতা প্রদর্শন করলেও পরবর্তীতে তারা কথিত বাস্তবতাকে স্বীকার করে নিয়ে আগ্রাসী শক্তির প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। চীন ও ভারত পরস্পর দীর্ঘদিনের শত্রু হওয়া সত্ত্বেও বর্তমানে তাদের যাবতীয় বিরোধ মিটিয়ে ফেলার পদক্ষেপ নিয়েছে এবং আন্তর্জাতিক ইসলামী জাগরণের মোকাবেলায় ইসরাইল, ভারত ও চীনের মধ্যে একটি জোট গঠনের কানাঘুষাও শোনা যাচ্ছে। অতএব, এটা সুস্পষ্ট যে, ইহুদী-খ্রীস্টান বা কাফের-মুনাফিকরা কারো সাথে বন্ধুত্ব করতে হলে কেবল তাদের নিজেদের মধ্য থেকেই করবে, কোন ঈমানদার মুসলমানের সাথে নয়। আর যদি ওদের কেউ কখনো কোন মুসলমানের সাথে বন্ধুত্বের ভাব প্রদর্শন করেও থাকে, সেটাও কোন বন্ধুত্বের তাগিদে নয়, বরং মুসলমানদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টির জন্যই করে থাকবে। কোন কাফের একই সাথে সকল মুসলমানের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করেছে কিংবা কোন শয়তান একই সাথে সকল মানুষকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছে এমন কোন দৃষ্টান্ত কেউ দেখাতে পারবেন কি? এক্ষেত্রে একজনের বন্ধু হয়ে তাকে অপর কারো বিরুদ্ধে ব্যবহার করা ছাড়া তাদের আর কোন উদ্দেশ্য থাকে না। পরস্পরের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা যদি সম্ভব নাও হয়, তথাপি একই সাথে দশজনকে কাবু করার চেয়ে একজনকে নিবৃত্ত রেখে আরেকজনকে ঘায়েল করা এবং এভাবে পর্যায়ক্রমে সকলকে পাকড়াও করা যে অধিক সহজ, এটা বোঝা কোন কঠিন ব্যাপার নয়। কোন কাফের বা শয়তান ব্যক্তি আল্লাহর বান্দাদের কারো সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনের পর তাকে অপর কোন ভাইয়ের বিরুদ্ধে উস্কানী প্রদান করেনি কিংবা কোনপ্রকার কুফর বা মন্দকর্মের দিকেও আকৃষ্ট বা প্ররোচিত করেনি, এমন কোন নজির জগতে খুঁজে পাওয়া যাবে কি? আল কুরআনে অন্যত্র বলা হয়েছে, "জালেমরা একে অপরের বন্ধু।" তাই তারা কেউ জুলুম করতে গিয়ে প্রতিরোধের সম্মুখীন হলে একে অপরের সাহায্যে

এগিয়ে আসে। আল্লাহ আরো বলেন, "আর কাফেররা পরস্পর সহযোগী, বন্ধু। তোমরা যদি এমন ব্যবস্থা না কর, তবে পৃথিবীতে ফেতনা ও বড় ধরনের ফাসাদ সৃষ্টি হবে।" (সুরা তওবাঃ৭৩) অর্থাৎ, শত্রুর ঐক্যের মোকাবেলায় আমরাও যদি পরস্পর ঐক্যবদ্ধ না হই, তাহলে সেই সুযোগে কাফেরদের ফেতনা-ফ্যাসাদের বীভৎসতা চরম আকার ধারণ করবে। সকল কাফের মুলতঃ একই কারখানার পণ্য। আর তাহল শয়তানের কারখানা।

"তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত।" অর্থাৎ, অমুসলিমরা যেহেতু নিজেরা পরস্পরের বন্ধু, তাই মুসলমানদের মধ্যে যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে তারা আর স্বজাতির অন্তর্ভুক্ত থাকবে না। এ সম্পর্কে অন্যত্র এরশাদ হচ্ছে, "মুমিনগণ যেন অন্য মুমিনকে ছেড়ে কোন কাফেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যারা এরূপ করবে আল্লাহর সাথে তাদের কোন সম্পর্ক থাকবে না।" (সুরা আল ইমরান) মানুষের বন্ধুত্ব মুলতঃ স্বগোত্রীয়দের মাঝেই স্থাপিত হয়। এ প্রসঙ্গে মহানবী (সাঃ) বলেন, "যে যে জাতির অনুসরণ করবে, সে ঐ জাতির মধ্যেই গণ্য হবে।" বন্ধুত্ব হয়ে থাকে সাধারণত তিনটি জিনিসের ভিত্তিতে; যথা- নীতি-আদর্শ তথা লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের মিল, স্বভাব-চরিত্রের মিল ও কৌশলগত স্বার্থ। কোন জাতির প্রতি বন্ধুত্ব, সমর্থন বা অনুরাগ ব্যক্ত করা মুলত সেই জাতির নীতি ও কার্যকলাপের প্রতি একাত্মতা প্রকাশেরই নামান্তর। অবশ্য কাফের হয়ে যাওয়ার হুকুম কেবল তখনই প্রযোজ্য হবে, যখন কুফরীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করা হয়। কিন্তু যদি আচার-ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে বা পার্থিব স্বার্থ ও ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতার কারণে কোন বিধর্মীর সাথে বন্ধুত্ব করা হয় তাহলে কাফের হবে না, কেবল গুনাহগার হবে। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, "মানুষ তার বন্ধুর ধর্মের দ্বারা প্রভাবিত হয়। অতএব, তোমাদের প্রত্যেকেরই দেখে নেয়া উচিত, সে কাকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবে।" (আবু দাউদ, তিরমিযী) অপর এক হাদীসে আছে, "যে ব্যক্তি কোন যালেমকে যালেম জেনেও তার পক্ষ নেবে, সে ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাবে।" তফসীর মাআরেফুল কোরআনে বলা হয়েছে, "যার মধ্যে ফিস্‌ক তথা পাপাসক্তির বীজাণু বিদ্যমান আছে, একমাত্র তার অন্তরেই কোন ফাসেক ও পাপাসক্তের প্রতি বন্ধুত্ব ও ভালবাসা থাকতে পারে।" অনুরূপভাবে, আল্লাহর শত্রুদের প্রতি বন্ধুত্বও কেবল তাদের মাঝেই থাকতে পারে, যাদের অন্তরে আল্লাহর প্রতি বিরক্তি ও নাশোকরীর মনোভাব ঘাপটি মেরে আছে। ইহুদী-খ্রীস্টানদের মুসলিম নিধনের কাজে যারা তেল সরবরাহ করে, ভুখণ্ড ব্যবহার করতে দেয়, কোটি কোটি ডলার ব্যয়ে বিলাসবহুল ঘাঁটি বানিয়ে দেয়, তারা কোন অংশে কম অপরাধী নয়। সুরা লাহাবে আল্লাহ বলেন, "এবং তার স্ত্রীও- যে ইন্ধন বহন করে।" অতএব, ইহুদীবাদের মুসলিম নামধারী সহযোগীরাও সমানভাবে শাস্তিযোগ্য। আল্লাহ তাআলার সুস্পষ্ট নির্দেশ, "হে নবী, আপনি জিহাদ করুন কাফের ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে আর তাদের প্রতি কঠোর হোন। তাদের ঠিকানা জাহান্নাম, তা কতই না নিকৃষ্ট পন্তব্য।" (সুরা তওবাঃ৭৩) অন্যত্র এরশাদ হচ্ছে, "আল্লাহ কেবল তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন, যারা ধর্মের ব্যাপারে তোমাদেরকে দেশ থেকে বহিষ্কৃত করেছে এবং বহিষ্কারকার্যে সহায়তা করেছে। যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করে তারাই যালেম।" (মুমতাহিনাঃ৯) আল্লাহর আদেশ লংঘন করে আল্লাহর দুশমনকে মুরুব্বী মানা স্বয়ং একটি বৃহৎ জুলুম, তদুপরি এটা আরো অনেক যুলুমের জন্ম দেয়। দুশমনকে খুশী করতে গিয়ে আপনজনের উপর কিছু না কিছু জুলুম করতেই হয়। মুসলিম বিশ্বের শাসকরা কুফরী শক্তির গোলামীর খাতিরেই ইসলামপ্রিয় জনগণের উপর নিষ্ঠুরতা চালাচ্ছে। কুফর ও জুলুম মুলতঃ এমনই ছোঁয়াচে রোগ যে, এসব রোগীর কাছে যারাই যাবে তারাই রোগাক্রান্ত হয়ে পড়বে।

"আল্লাহ জালেম সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না।" উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা জালেমের যে সংজ্ঞা পেলাম তাহল যারা ধর্মীয় কারণে মুসলমানদের উপর জুলুম করে এবং যারা সেই জুলুমকারীদের সাথে বন্ধুত্ব করে। আর এখানে আমরা জানতে পারলাম যে, ঐ সমস্ত জালেমদের আল্লাহ হেদায়েত করেন না। এ থেকে আমরা তিনটি বিষয় শিক্ষা পাই; এক, ইহুদী-খ্রীস্টানরা মুসলমানদের উপর সীমাহীন বর্বরতা চালানোর মাধ্যমে জালেমরূপে প্রতীয়মান হওয়ায় তাদের যেহেতু হেদায়েতের সম্ভাবনা নেই, তাই তাদের সাথে বন্ধুত্বের প্রয়াস অর্থহীন। কারণ, যারা কোনদিন সৎপথে আসবে না, তাদের সাথে বন্ধুত্বের দ্বারা ইসলাম ও মানবতার কোন কল্যাণ আশা করা যায় না। দুই, যারা ধর্মীয় ও জাতীয় স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে বিধর্মী ও বিজাতীয়দের সাথে বন্ধুত্ব করে, তাদেরকেও দালালী ও পাদ্দারীর পথ থেকে ঈমানদারীর পথে ফিরিয়ে আনা যাবে না। তিন, যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করে জালেমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে তারাও হেদায়েতের যোগ্যতা হারাবে। অতএব, যে কাজে আমাদের ঈমানের ঝুঁকি আছে, তা যেন আমরা না করি। সুরা বাকারার ৬ষ্ঠ ও ৭ম আয়াতে এরশাদ হচ্ছে, "নিশ্চয়ই যারা কাফের হয়েছে তাদেরকে আপনি ভয় প্রদর্শন করুন আর নাই করুন তাতে কিছুই আসে যায় না, তারা ঈমান আনবে না। আল্লাহ তাদের অন্তকরণ এবং তাদের কানসমূহ বন্ধ করে দিয়েছেন, আর তাদের চোখসমূহ পর্দায় ঢেকে দিয়েছেন। আর তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি।" অর্থাৎ, যারা জেনেবুঝে আল্লাহর বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে, তাদের পক্ষে আল্লাহর পথে ফিরে আসা বা আল্লাহর বান্দাদের প্রতি দয়ার্দ্র হওয়ার আদৌ কোন সম্ভাবনা নেই। কারণ, আল্লাহই তাদের হৃদয়, কান ও চোখে এমনভাবে তালা লাগিয়ে দিয়েছেন যে, সত্যের আহবান কিংবা মজলুমের আর্তনাদ কোনটাই তাদের হৃদয়ে যেমন আঁচড় কাটবে না, কর্ণকুহরেও প্রবেশ করবে না, তাদের চোখও আল্লাহর নিদর্শন কিংবা বান্দাদের দুর্দশা কিছুই দেখবে না। ভাল কিছু শোনা, দেখা বা উপলব্ধি করার ব্যাপারে তারা সর্বদাই কৃপণতার পরিচয় দেয়। তাদের মেধা ও ইন্দ্রিয়শক্তি শয়তানের জন্যই নিবেদিত। তাদের যাবতীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও চিন্তাশক্তি ইসলামের বিরোধিতার জন্যই সংরক্ষিত। তাই তাদের জন্য আল্লাহ হেদায়েত ও মাগফেরাতের পরিবর্তে আযাবের ফয়সালাই নির্ধারণ করে রেখেছেন। আল্লাহ যাদেরকে জালেম হওয়ার কারণে হেদায়েত করেন না তাদের কিছু বৈশিষ্ট্যও বর্ণনা করে দিয়েছেন আল কুরআনের বিভিন্ন স্থানে। সাধারণভাবে কাফের ও জালেমদের পরিচিতি ও কার্যকলাপ এবং পার্থিব ও পারলৌকিক পরিণতি সম্পর্কে রয়েছে শতশত আয়াত। সেসব ক্ষেত্রে আযাবের হুঁশিয়ারী কেবল তখনই কার্যকর করা হবে, যদি সেই সমস্ত অপরাধীরা তওবা না করে। কিন্তু কিছু কিছু লোকের জুলুম সীমা অতিক্রম করায় তাদের বেলায় এটা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, তারা কোনদিন তওবাই করবে না এবং আল্লাহই তাদেরকে হেদায়েত না করার কথা নিশ্চিতভাবে ঘোষণা করে দিয়েছেন। কি কি জুলুমের কারণে তাদের ললাটে স্থায়ী গোমরাহী নির্ধারিত হয়ে গেছে সেই সমস্ত জুলুমের পর্যাপ্ত বিবরণ রয়েছে আল্লাহর কিতাবে। সবচেয়ে বড় জুলুম হল স্রষ্টার দেয়া নেয়ামত ভোগ করে তাঁরই সাথে শত্রুতা করা এবং সেই সাথে আপন স্রষ্টাকে যারা মেনে চলতে চায় তাদেরকে নানাভাবে হয়রানি করা। যারা নিজে

থেকেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইসলামের বিরুদ্ধাচরণ ও মুসলমানদের উপর নির্যাতন করে এবং যারা কাফের বন্ধুদের প্ররোচনায় ঈমান ও দয়া-মায়াকে বিসর্জন দিয়ে আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও বান্দাদের উপর জুলুম করে তারা উভয়েই আল্লাহর কাছে জালেম হিসেবে পণ্য। ইহুদী-খ্রীস্টানদের আরো একটি উল্লেখযোগ্য জুলুম হচ্ছে জেনেশুনে আল্লাহর নামে মিথ্যা কথা বলা। "যে ইসলামের দিকে আহুত হয়েও আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা বলে, তার চাইতে অধিক জালেম আর কে? আল্লাহ যালেম সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না।" (আছছফ্ঃ৭) তাদের জালেম হবার আরো একটি কারণ হলো কায়েমী স্বার্থবাদ ও স্বেচ্ছাচারিতা। এ সম্পর্কে বলা হচ্ছে, "এরপরেও যদি তারা আপনার কথায় সাড়া না দেয়, তবে জানবেন, তারা শুধু নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। আল্লাহর হেদায়েতের পরিবর্তে যে ব্যক্তি নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, তার চাইতে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে? নিশ্চয় আল্লাহ জালেম সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না।" (কাসাসঃ৫০) অর্থাৎ, যারা নিজের দেহ ও মনের চাহিদা পুরণ করতে গিয়ে ভাল-মন্দ, হালাল-হারাম, ন্যায়-অন্যায় ও সত্য-মিথ্যার কোন পার্থক্য করে না, তাদের পক্ষে সত্যের সন্ধান পাওয়া বা পেলেও তা গ্রহণ করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। সবচেয়ে মারাত্মক জুলুম হচ্ছে মুনাফেকী, যা ইসলামের শত্রুরা সকলেই কমবেশী করে থাকে। এ মুনাফেকী ধর্ম নিয়ে হতে পারে- প্রথমে ধর্ম গ্রহণের ঘোষণা দিয়ে পরে আবার নিজের ধর্মহীনতার কথা প্রকাশ করা। অবস্থান নিয়ে হতে পারে যে, প্রথমে মুসলমানদের সাথে থাকার ওয়াদা দিয়ে পরে মুসলিম সমাজ ত্যাগ করে কুফরী সমাজে চলে যাওয়া। আবার সাহায্য নিয়েও হতে পারে, তাহল যুদ্ধ-জিহাদ বা কোন জরুরী প্রয়োজনে মুসলমানদের সঙ্গী ও সাহায্যকারী হবার আশ্বাস দিয়ে যাত্রা শুরু করে আকস্মিকভাবে কেটে পড়া। কাফেররা কখনো ইসলামের লেবাস পরে আবার কখনো বা মানবতাবাদের বেশ ধরে মুসলমানদের বন্ধু সেজে সাহায্য করার ওয়াদা দিয়ে বিভ্রান্ত করে থাকে। একবার কতিপয় মুশরিক মক্কা থেকে মদীনায় এসে প্রকাশ করে যে, তারা মুসলমান; হিজরত করে মদীনায় এসেছে। কিছুদিন পর তারা ধর্মত্যাগী হয়ে যায় এবং রাসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে পণ্যদ্রব্য আনার অজুহাত পেশ করে পুনরায় মক্কায় চলে যায়। এরপর তারা আর ফিরে আসেনি। এদের সম্পর্কে মুসলমানদের মধ্যে দ্বিমত দেখা যায়। কেউ কেউ বলল এরা কাফের, আর কেউ কেউ বলল এরা মুমিন। আবার উহুদ যুদ্ধের যাত্রাপথেও যারা দলত্যাগ করে ফিরে গিয়েছিল, যুদ্ধের পর তাদের নিয়েও মুসলমানদের মাঝে মতভেদ দেখা দেয়। এসব ঘটনার প্রেক্ষিতে মুসলমানদের মতভেদ নিরসনের জন্য আল্লাহ তাআলা আয়াত নাযিল করেন, "অতঃপর তোমাদের কি হল যে, মুনাফিকদের সম্পর্কে তোমরা দু'দল হয়ে গেলে? অথচ আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ঘুরিয়ে দিয়েছেন তাদের মন্দ কাজের কারণে। তোমরা কি তাদেরকে হেদায়েত করতে চাও, যাদেরকে আল্লাহ পথভ্রষ্ট করেছেন? আল্লাহ যাকে পথভ্রান্ত করেন, তুমি তার জন্য কোন পথ পাবে না। তারা চায় যে, তারা যেমন কাফের, তোমরাও তেমনি কাফের হয়ে যাও, যাতে তোমরা এবং তারা সব সমান হয়ে যাও। অতএব, তাদের মধ্যে কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহর পথে হিজরত করে চলে আসে। অতঃপর যদি তারা বিমুখ হয়, তবে তাদেরকে পাকড়াও কর এবং যেখানে পাও হত্যা কর। তাদের মধ্যে কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না এবং সাহায্যকারী বানিও না।" (সুরা নিসাঃ৮৮,৮৯) অর্থাৎ, এসব লোককে আল্লাহই পথভ্রষ্ট রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাই এদেরকে হেদায়েতপ্রাপ্ত মনে করা তো দুরের কথা, হেদায়েতযোগ্য বলে বিবেচনা করারও অবকাশ নেই। আল্লাহ যাদেরকে কাফের-মুনাফিক বলে রায় দিয়েছেন, তাদেরকে মুমিন হিসেবে গ্রহণ করার অধিকার মানুষের নেই। আলেমুল গায়েব আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কয়লা ধোয়ার ব্যর্থ প্রয়াস থেকে সতর্ক করেছেন এই বলে যে, আল্লাহ যাকে পথভ্রান্ত করেন, তুমি তার জন্য কোন পথ পাবে না। তারা নিজেরা হেদায়েত গ্রহণ করা তো দুরের কথা, বরং আমাদেরকেই গোমরাহ করে দিতে চায়। আল্লাহ তাদেরকে যেমন তাদের মন্দ কাজের কারণে ইসলাম ও মুসলমানদের দিক থেকে ঘুরিয়ে কাফেরদের মাঝে ফিরিয়ে দিয়েছেন, তেমনি তারা আমাদেরকেও মন্দ কর্মে লিপ্ত করার মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে খোদাদ্রোহী দলে অন্তর্ভুক্ত করে নিতে চায়। তারা যেহেতু আমাদের কাফের বানাতে চায়, তাই তাদের কাউকে বন্ধু বানালে তার প্রভাবে আমাদের দ্বীন বিপন্ন হবার আশঙ্কা রয়েছে। অতএব, তারা যতক্ষণ পর্যন্ত দারুল কুফর থেকে বেরিয়ে এসে হিজরতের মাধ্যমে দারুল ইসলামে প্রবেশ না করবে, বিরোধিতার নীতি পরিহার করে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে আন্তরিক সহযোগিতা না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের সাথে বন্ধুত্ব করা যাবে না। "অতঃপর যদি তারা বিমুখ হয়, তবে তাদেরকে পাকড়াও কর এবং যেখানে পাও হত্যা কর।" অর্থাৎ, কেউ যদি ইসলাম গ্রহণ ও মুসলিম পক্ষে যোগদানের পর পুনরায় ধর্ম ও দল ত্যাগ করে কাফেরদের সাথে যোগদান করে, তাহলে মৃত্যুদণ্ডই তার প্রাপ্য। কারণ, বিশ্বাসঘাতক, প্রতারক ও জালেমদের জন্য কোন হেদায়েতের ব্যবস্থা নেই। অতএব, এসব মুরতাদের মধ্যে কাউকে বন্ধু বা সাহায্যকারী হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না। মুসলমানরা কেবল তাদের কাছেই সাহায্য পেতে পারে, যারা কুফরের দাসত্বের শৃঙ্খল ছিন্ন করে মুসলমানদের সাথে যোগ দিয়েছে; যারা মুসলমানদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে তাদের কাছে নয়। একবার যারা বিশ্বাসঘাতকতা করে শত্রুর সাথে যোগ দিয়েছে কিংবা বন্ধুদের বিপদের মুখে ঠেলে দিয়ে নিজেরা পশ্চাদপসরণ করে চলে গেছে, তাদেরকে পুনরায় বিশ্বাস করা মোটেই নিরাপদ নয়। যারা দারুল ইসলাম ত্যাগ করে স্থায়ীভাবে দারুল কুফরে চলে গেছে তারা যেমন মুসলমানদের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না; তেমনি যারা ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাস করেও কাফেরদের পক্ষে গুপ্তচরবৃত্তিতে লিপ্ত, তাদেরকে বন্ধু ও সহযোগী হিসেবে গ্রহণ করাটাও কোন অংশে কম বিপজ্জনক নয়। মদীনাবাসী মুনাফিকরা যেদিন উহুদের যুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, সেদিনই তাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়ে যায় যে, তারা মুসলমানদের সাহায্যকারী হতে পারে না। অবশ্য এরপরেও তাদেরকে বিভিন্ন জিহাদে অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া হয় মুলত তাদের কাণ্ডকারখানাকে জনসমক্ষে ফুটিয়ে তোলার মাধ্যমে তাদের সাহায্যকে বর্জনের যথার্থতা প্রমাণের জন্য। তারা কখনো মুসলমানদের সাহায্য করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে, আবার কখনো সাহায্যের নামে পিয়ে পাদ্দারী করেছে। বিশেষত যখনই মুসলমানদের অস্তিত্বের সঙ্কট দেখা দিয়েছে, মুসলমানরা বড় ধরনের বিপদের সম্মুখীন হয়েছে, তখনই তারা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। তাদের এ অসহযোগী ও বৈরী মানসিকতার চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ ঘটে মহানবীর (সাঃ) জীবনের সর্বশেষ যুদ্ধ তাবুক অভিযানের সময়। তাই এ যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর আল্লাহ তাআলা মুনাফিকদের ব্যাপারে ফরমান জারি করলেন, "বস্তুতঃ আল্লাহ যদি তোমাকে তাদের মধ্য থেকে কোন শ্রেণীবিশেষের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যান এবং অতঃপর তারা তোমার কাছে অভিযানে বেরোবার অনুমতি কামনা করে, তবে তুমি বলো যে, তোমরা কখনো আমার সাথে বেরোবে না এবং আমার পক্ষ হয়ে কোন শত্রুর সাথে যুদ্ধ করবে না; তোমরা তো প্রথমবারে

BLACK ICE
SOFTWARE INC.
Driver Demo

বসে থাকা পছন্দ করেছ, কাজেই পেছনে পড়ে থাকা লোকদের সাথেই বসে থাক।" (তওবাঃ৮৩) রাসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর জীবন সায়াহ্নে অবতীর্ণ এ আয়াতটির মাধ্যমে মুমিনদের জন্য মুনাফিকদের সাহায্যকে স্থায়ীভাবে হারাম করে দেয়া হলো। প্রথমে যারা সাহায্যের আহবান সত্ত্বেও নানা ছলছুতায় মুসলমানদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, তারাই যখন স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে মুসলমানদের সহযোগী হিসেবে জিহাদে অংশগ্রহণের আগ্রহ ব্যক্ত করবে, তখন বুঝতে হবে নিশ্চয়ই কোন মতলব আছে। তাই আল্লাহ তাদের ফিরিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। প্রথম সুযোগে যারা সেবার পরিবর্তে শোষণ ও নির্যাতন চালিয়েছে, তাদেরকে আর একটিবার সুযোগ দেয়া একই সাপের গর্তে দু'বার পা দেয়ার সমতুল্য। একবার যারা খেয়ানত করেছে, তাদেরকে পুনর্বার খেদমতও করতে দেয়া উচিত নয়। এর কারণ প্রসঙ্গে এরশাদ হচ্ছে, "যদি তোমাদের সাথে তারা বের হত, তবে তোমাদের অনিষ্ট ছাড়া আর কিছু বৃদ্ধি করত না, আর অশ্ব ছুটাতো তোমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে। আর তোমাদের মাঝে রয়েছে তাদের গুপ্তচর। বস্তুতঃ আল্লাহ যালিমদের ভালভাবেই জানেন। তারা পূর্ব থেকেই বিভেদ সৃষ্টির সুযোগ সন্ধানে ছিল এবং আপনার কার্যসমূহ ওলট-পালট করে দিচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত সত্য প্রতিশ্রুতি এসে গেল এবং জয়ী হল আল্লাহর হুকুম, যে অবস্থায় তারা মন্দবোধ করল।" (সুরা তওবাঃ৪৭, ৪৮) অতএব, তাদেরকে নিজেদের সাথে না নেওয়াটাই অধিক নিরাপদ। আমরা জালেমদের চিনতে ভুল করলেও আল্লাহ তাদের সম্পর্কে ভালভাবেই জানেন যে, তারা মুসলমানদের বন্ধু নয় এবং ভবিষ্যতেও কোনদিন হেদায়েত পেয়ে মুসলমানদের সাহায্যকারী হবে না। তাই তাদের সাহায্য গ্রহণ করাকে আমাদের জন্য হারাম করে দিয়েছেন। মুনাফিকদের অবাধ্যতামুলক আচরণের প্রেক্ষিতে আল্লাহ তাঁর রাসুলকে (সাঃ) সান্ত্বনা দিয়েছেন যে, ওদের এসব ছলনা নতুন কিছু নয়। যাদের অন্তর ইসলামবিদ্বেষী, তাদের কাছ থেকে ইসলামের পক্ষে কোন ইতিবাচক ভুমিকা আশা করা তো দুরের কথা, তাদের ভুমিকা ইসলামের বিপক্ষে হওয়াটাই স্বাভাবিক। তারা পুর্ব থেকেই নেতিবাচক তৎপরতা চালিয়ে আসছে- যা মাঝেমধ্যে প্রকাশ্য রূপ ধারণ করে মাত্র। মুসলমানদের কোন কাজে সাহায্য করা তো দুরের কথা, বরং সমস্ত কর্মকাণ্ডকে ওলট-পালট করে দেয়াই মুনাফিকদের কাজ। ইসলাম ও মুসলমানের কল্যাণে যত পদক্ষেপই নেয়া হোক না কেন, তারা সর্বদাই নানা কৌশলে মুসলমানদের বাড়া ভাতে ছাই দিতে সচেষ্ট। মুসলমানদের ঈমানী শক্তি, জিহাদী চেতনা আর ঐক্যের মাঝে ফাটল ধরানোর চেষ্টাতেই তারা তৎপর ছিল। শেষ পর্যন্ত যখন আল্লাহর হুকুমে মুসলমানরা ঈমানের জোর আর জিহাদী তামান্নায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে বিজয়কে ছিনিয়ে আনল, তখন মুনাফিকরা মনমরা হয়ে গেল। কারণ, তারা ঈমানদারদের মাঝে যে পারস্পরিক প্রতিহিংসার বীজ বপন করতে চেয়েছিল, ঈমানদাররা যখন নিজেরা তাতে লিপ্ত হবার পরিবর্তে নিজ নিজ ঘৃণা ও শত্রুতাকে বহিঃশত্রু কাফেরদের দিকে নিবদ্ধ করল, তখন ঘরের শত্রু মুনাফিকরা স্বাভাবিকভাবেই হতাশ হয়ে গেল। যাদের অতীত রেকর্ড ও বর্তমান ভুমিকা বন্ধুসুলভ নয়, মুসলমানদের সহযোগিতার পরিবর্তে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করাই যাদের কাজ, যারা মুসলমানদের পরাজয় দেখতেই আগ্রহী এবং বিজয় দেখলে অসন্তুষ্ট হয়, তারা ভবিষ্যতেও মুসলমানদের সাহায্যকারী হবে না। তাই তাদের কাছ থেকে কোনপ্রকার সামরিক বা আর্থিক সাহায্য গ্রহণ না করাটাই আল্লাহ পাকের সিদ্ধান্ত। কারণ বেঈমানের সাহায্যে কোন বরকত নেই, কেবল পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াই আছে। আর যদি তারা মুসলমানদের কোনপ্রকার সাহায্য-সহযোগিতা করেই ফেলে, তবুও তা আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না। "তাদের অর্থ ব্যয় কবুল না হওয়ার এছাড়া আর কোন কারণ নেই যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি অবিশ্বাসী, তারা নামাযে আসে অলসতার সাথে আর ব্যয় করে সঙ্কুচিত মনে।" (তওবাঃ৫৪) অতএব, আল্লাহ যা কবুল করেন না, তা আমাদেরও গ্রহণ করা অনুচিত। ইসলামী জিহাদ কিংবা মুসলমানদের যে কোন কাজে মুনাফিকরা কেবল তখনই এগিয়ে আসতে উদ্যোগী হয়, যখন বুঝতে পারে যে, তাদের অংশগ্রহণ ছাড়াই মুসলমানরা সফলতা লাভে সক্ষম। অতএব খামাখা নিজেদের কৃতিত্ব হাতছাড়া করা এবং মুসলমানদের সাফল্যকে নির্ভেজাল হতে দেয়ার চেয়ে মুসলমানদের সাথে যোগ দিয়েই তারা নিজেদের উদ্দেশ্য হাসিল করতে চায়। তাই আল্লাহ এমন লোকদের দুরে সরিয়ে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। মুসলিম জনগণের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব ইসলামের সপক্ষ শক্তির হাতেই থাকা উচিত। মুসলিম বাহিনী যাতে ইসলামবিরোধী শক্তির হাতে জিম্মি হয়ে না পড়ে সেজন্যই আল্লাহ সতর্কতা অবলম্বনের বিধান দিয়েছেন। ইসলামী বাহিনীতে যেন এমন কেউ স্থান না পায় যারা ইসলামী চেতনায় বিশ্বাসী নয়, ইসলামের শত্রুদের ডাকে সাড়া দিতেই যারা অধিক উৎসাহী। এদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন, "যদি শত্রুপক্ষ চতুর্দিক থেকে নগরে প্রবেশ করে তাদের সাথে মিলিত হত, অতঃপর বিদ্রোহ করতে প্ররোচিত করত, তবে তারা অবশ্যই বিদ্রোহ করত এবং তারা মোটেই বিলম্ব করত না।" (সুরা আহযাবঃ১৪) অতএব, যারা সুযোগ পেলেই দৌড়ে গিয়ে কাফেরদের সাথে মিলিত হবে, তাদেরকে মুসলমানদের দলে রাখা মোটেই নিরাপদ নয়। যারা আমাদের শত্রুর সাথে মিলিত হয়ে গেছে এবং যারা শত্রুর সাথে মিলিত হতে আগ্রহী তাদের উভয়ের বন্ধুত্ব ও সাহায্যই আমাদের জন্য সমভাবে পরিত্যাজ্য। আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের প্রতি সেই সমস্ত মুনাফিকদের সাহায্য বর্জনের আদেশ দিয়েছেন, যারা নিজেদেরকে মুসলিম বলে পরিচয় দেয় এবং যাদের ব্যাপারে মুসলমানদের মধ্যেই মতবিরোধ রয়েছে। এমতাবস্থায় যারা আত্মস্বীকৃত কাফের, যাদের কাফের হবার ব্যাপারে গোটা মুসলিম জাতির ঐকমত্য রয়েছে, তাদের সাহায্য গ্রহণের ব্যাপারে আল্লাহর হুকুম যে কি হবে তা বলাই বাহুল্য। মুনাফিকদের সাহায্য নিষিদ্ধ হবার যে কারণ বর্ণিত হয়েছে, তাহল তারা আমাদের সাথে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার ভান করে পরে আর বন্ধুত্বসুলভ ও সহযোগিতামুলক আচরণ করে না। লক্ষণীয় যে, ইহুদী-খ্রীস্টানরা এ পদ্ধতিটা বরাবরই অবলম্বন করে আসছে। বসনিয়ার মুসলমানদের তারা কিভাবে সাহায্যের ওয়াদা দিয়ে ঘুরিয়েছে তা কিছুতেই বিস্মৃত হবার নয়। সাহায্য শেষ পর্যন্ত করেছে বটে, তবে বেশ চড়া মুল্যে। সহযোগিতা কখনো একতরফা হয় না। সাহায্য কেউ কাউকে উদ্দেশ্যহীনভাবে করে না। আর মুসলমানদের প্রতি অমুসলিমদের উদ্দেশ্য কখনো সৎ হতে পারে না। আমাদের মুলতঃ নৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে গ্রাস করাটাই বিধর্মী সাহায্যদাতাদের লক্ষ্য। কেননা উপরের হাত স্বাভাবিকভাবেই নিচের হাতের চেয়ে শক্তিশালী ও প্রাধান্যশীল থাকবে। আমরা ভাল কাজে ইহুদী-খৃষ্টানদের সাহায্যকারী বানালেও এর বিনিময়ে তাদের মন্দ কাজে আমাদের সমর্থন যোগাতে হবে। এছাড়া অর্থনৈতিক ও সামরিক ক্ষেত্রেও আমাদেরকে সাহায্য করার ছলে তারাই ফায়দা হাসিল করে নেয়। আর্থিক ক্ষেত্রে তারা ঋণ সাহায্য দিয়ে আমাদের কাছ থেকে সুদে আসলে বহুগুণ অধিক অর্থ উসুল করে নেয়। অস্ত্র বিক্রির ক্ষেত্রে আমাদের প্রতিরক্ষাকে তাদের উপর নির্ভরশীল করে প্রয়োজনের সময় অস্ত্রের খুচরা যন্ত্রাংশের সরবরাহ বন্ধ করে দিয়ে

আমাদের সামরিক শক্তিকে পঙ্গু করে দেয়। আমাদেরকে সামরিক প্রশিক্ষণ দিতে গিয়ে তারা আমাদের গোপন সামরিক তথ্য জেনে নিতে পারে, আমাদের সৈনিকদেরকে প্রলোভন দেখিয়ে ভাগিয়ে নেয়ার প্রয়াস চালাতে পারে কিংবা অশিক্ষা-কুশিক্ষা দিয়ে আমাদের নৈতিক মানকে ক্ষুণ্ন করার চেষ্টা করতে পারে। তারা নিজেরা যেচে এগিয়ে এসে মুসলমানদের সাহায্যকারীরূপে আত্মপ্রকাশ করতে চাইলেও মুসলমানরা পরস্পরের সাথে ভালবাসা ও সহযোগিতার বন্ধনে আবদ্ধ হোক এটা তারা পছন্দ করে না। মার্কিন সাহায্য লাভের জন্য বসনিয়াকে মুসলিম বিশ্বের সাথে সহযোগিতা না করার ওয়াদা দিতে হয়েছে। কোন সামরিক বা সরকারী কর্মকর্তা কোন মুসলিম দেশের সাথে সম্পর্ক রাখতে চাইলে সে অপরাধে তাদের বরখাস্ত করা হয়েছে। এমনকি বিদেশী মুজাহিদরা জান বাজি রেখে যে মুসলিম ভাইদের সাহায্যে এগিয়ে আসল, সে মুসলিম ভাইয়েরাই বিদেশী প্রভুদের চাপের মুখে সাহায্যকারী ভাইদের তাড়িয়ে দেয়। এমনকি শেষ পর্যন্ত মুজাহিদদের ধরে শত্রুর হাতে তুলে দিতেও দ্বিধা করেনি নির্বোধ ও হতভাগ্য, কাপুরুষ ও অকৃতজ্ঞ মুসলমানরা। কিন্তু একজন আফগান মুজাহিদের শূন্যস্থান দশটি মার্কিন ট্যাংকের দ্বারাও পুরণ হবার নয়। শত্রুর কাছে তিল পরিমাণ সাহায্য পেতে হলেও এর জন্য আপন ভাইদেরকে দূরে সরিয়ে দেয়ার শর্ত পালন করতে হয়। পরবর্তীতে কসোভোর মুসলমানদেরও ন্যাটোর কাছ থেকে কিছু এয়ার সাপোর্ট পাওয়ার বিনিময়ে সমগ্র দেশটাকে ন্যাটোর হাতে তুলে দিতে হয়েছে। নিষ্পাপ বালিকাদের ইজ্জতও খোয়াতে হয়েছে মার্কিন সৈন্যদের হাতে। ন্যাটোর হাতে সার্বদের কিছু অস্ত্র ধ্বংস হলেও মুসলমানদের সকল অস্ত্রই বাজেয়াপ্ত হয়ে গেছে। অতএব, শত্রুর কাছ থেকে যে পরিমাণ সাহায্য পাওয়া যায় তার চেয়ে মূল্য দিতে হয় বহুগুণ বেশি। এদিকে বাংলাদেশসহ উন্নয়নশীল মুসলিম বিশ্বে অমুসলিম দাতা দেশগুলো ঋণদানের বিনিময়ে আমাদের উপর অনেক সর্বনাশা শর্ত চাপিয়ে দেয়। তাদের দেয়া যাবতীয় অর্থই অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় করতে বাধ্য করে। কিন্তু সেই অর্থ সুদে আসলে ফেরত দিতে হয় আমাদের নিজস্ব সম্পদ থেকেই। এভাবে আমাদের পকেটের টাকাই চলে যাচ্ছে কার্যত অপ্রয়োজনীয় বিলাসদ্রব্যের পেছনে। পরের দেয়া সাহায্য কেউ নিজের ইচ্ছামত ভোগ-ব্যবহার করতে পারে না। বৈদেশিক সাহায্যের শর্ত পুরণ করতে গিয়ে আর্থিক ও রাজনৈতিক ক্ষতির পাশাপাশি ধর্মীয় ও নৈতিক ক্ষতিকেও স্বীকার করে নিতে হয়। কেউ যদি তোমাকে এই শর্তে একমুঠো আঙ্গুর দান করে যে তা তাজা ও পবিত্র অবস্থায় খেতে পারবে না, বরং মদ বানিয়ে খেতে হবে, তবে কি তুমি তা গ্রহণ করবে? কাফেররা তো আমাদের পান্তা ভাতটুকুও হালালভাবে খেতে দেবে না। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) আল্লাহর কাছে এই মর্মে দোয়া করতেন যে, আমাকে কোন ফাসেকের কাছে ঋণী হতে দিও না। জাগতিক ও ব্যক্তিগত প্রয়োজন থেকে শুরু করে ধর্মীয় ও জাতীয় প্রয়োজন পর্যন্ত কোন ক্ষেত্রেই কোন কাফের-মুনাফিকের সাহায্য গ্রহণ করা যাবে না। সুরা নিসার আয়াতদ্বয় তৎকালীন মুনাফিকদের বিশেষ বিশেষ দলের সম্পর্কে অবতীর্ণ হলেও এসব হুকুম মুলত সকল কাফের-মুনাফিকের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। বর্ণিত আছে যে, আনসাররা রাসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে কাফেরদের বিরুদ্ধে ইহুদীদের কাছ থেকে সাহায্য চাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করলে তিনি বললেন, "এরা দুরাচারী জাতি। তাদের প্রয়োজন আমাদের নেই।" যেখানে কাফেরদের বিরুদ্ধেই ইহুদী-খ্রীস্টানদের কাছে সাহায্য চাওয়া যায় না, সেখানে মুসলিম ভাইদের মোকাবেলায় তাদেরকে ডেকে আনা বড়ই দুঃখজনক। এ অনুচ্ছেদের আলোচনা থেকে যে সিদ্ধান্ত হল তা মোটামুটি এরূপ-- ইহুদী-খ্রীস্টানরা জালেম, তাই আল্লাহ তাদের হেদায়েত করবেন না। আল্লাহ যেহেতু তাদের হেদায়েত করবেন না, তাই আমরাও তাদেরকে হেদায়েত করতে পারব না। যাদেরকে হেদায়েত করা যায় না, তাদের সাথে বন্ধুত্ব করাও অসম্ভব। অতএব, তাদের সাথে আমাদের সম্পর্ক হবে বন্ধুত্ব বা সহযোগিতার নয়, বরং শত্রুতা ও মোকাবেলার। খোদাদ্রোহী জালেমদের দিকে আমাদের ঘাতকের হাতই বাড়িয়ে দিতে হবে, সাহায্য বা ভিক্ষার হাত নয়।

যখন সুরা মায়েদার ৫১ নং আয়াতটি অবতীর্ণ হয় এবং মুসলমানদেরকে ইহুদী-খ্রীস্টানদের সাথে গভীর বন্ধুত্ব স্থাপন করতে নিষেধ করে দেয়া হয়, তখন ওবাদা ইবনে সামেত (রাঃ) প্রমুখ সাহাবী প্রকাশ্যভাবে তাদের সাথে চুক্তি বিলোপ ও অসহযোগের কথা ঘোষণা করেন। তিনি একবার আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে বললেন, "আমার বহুসংখ্যক ইহুদী বন্ধু রয়েছে, শক্তি ও ক্ষমতার দিক দিয়ে তারা খুবই শক্তিশালী; কিন্তু আমি তাদের বন্ধুত্ব পরিহার করে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকেই বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছি। আল্লাহ ও রাসুল (সাঃ) ছাড়া আমার আর কোন বন্ধু ও সাহায্যকারী নেই। তাঁদের বন্ধুত্বই আমার জন্য যথেষ্ট।" তখন ইবনে উবাই বলল, "তুমি ইহুদীদের বন্ধুত্ব পরিত্যাগ করছ, কিন্তু আমি তাদের বন্ধুত্ব পরিহার করতে পারি না। কেননা, আমি যুগ ও জামানার পরিবর্তনের ব্যাপারে শংকিত। সুতরাং তাদের বন্ধুত্ব আমার জন্য অপরিহার্য।" তখন নবী করীম (সাঃ) আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে বললেন, "হে বন্ধুত্বের পিতা! তুমি উবাদা ইবনে সামেতের মোকাবেলায় ইহুদীদের বন্ধুত্ব ছাড়া শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে পারছ না। সে ব্যতীত ওরাই তোমার বন্ধু।" তখন আবদুল্লাহ বলল, "হ্যাঁ, এটাই কথা, আমি তাদের বন্ধুত্ব ত্যাগ করতে পারব না।" যারা কপট বিশ্বাসের অধীনে মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত ছিল কিংবা যারা তখনও ঈমানের দিক দিয়ে দুর্বল ছিল, তারা ইহুদী-খৃস্টানদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করার মধ্যে সমুহ বিপদাশঙ্কা অনুভব করত। ইহুদী-নাসারাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও তারা তাদের সাথে গভীর সম্পর্ক রক্ষা করে চলত। তাদের প্রতি অগাধ ভালবাসা পোষণ করত এবং তাদের সাথে খুবই যোগাযোগ ও আদান-প্রদান ছিল। তারা চিন্তা করত, যদি মুশরিক ও ইহুদীদের চক্রান্ত সফল হয়ে যায় এবং মুসলমানরা পরাজিত হয়, তবে আমাদের প্রাণ রক্ষার একটা উপায় থাকা দরকার। এ কারণেই ইবনে উবাই বলেছিল, "এদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা আমার মতে বিপজ্জনক। তাই আমি তা করতে পারি না।" এর পরিপ্রেক্ষিতে সুরা মায়েদার ৫২ নং আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

মুসলমানদের মধ্যে যারা মানসিক রোগাক্রান্ত তথা পাগল, কেবলমাত্র তারাই ইসলামের শত্রুদের সাথে দহরম মহরমে মেতে উঠতে পারে। এখানে অন্তরের রোগ বলতে ভীরুতা, হতাশা ও দুর্বলতার রোগ কিংবা কুফর, নিফাক ও শত্রুতার রোগ দুটোই হতে পারে। মুসলমানদের বেলায় প্রথমটি এবং মুনাফিকদের বেলায় দ্বিতীয় অর্থটি প্রযোজ্য। বর্তমান মুসলিম বিশ্বের নেতারাও এই দুটি সুত্রের কোন না কোনটির আওতায় পড়ে নিজেদের মানসিক দৈন্যতার পরিচয় দেন। ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে নেতানিয়াহু বলেছিলেন, "কতক নেতা ইসরাইলকে বয়কট করার গালভরা বুলি আওড়ান, কিন্তু তাঁরা শুধু আমাদের দিকেই আসছেন না, বরং এ লক্ষ্যে লক্ষও প্রদান করছেন।" বাস্তবেই মুসলিম রাষ্ট্রগুলো একে অপরের সাথে

প্রতিযোগিতা করে ইসরাইলের সাথে সম্পর্ক স্থাপনে অগ্রসর হচ্ছে। মৃত্যুর ভয়, ক্ষমতা হারানোর আশঙ্কা, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ বিনষ্ট হবার সম্ভাবনা প্রভৃতি কারণে তারা ইহুদী-খ্রীস্টানদের দরবারে ছোটাছুটি করে।

বিধর্মীদের সাথে বন্ধুত্ব না রাখলে, সম্পর্ক ছিন্ন করলে বা তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করলে আমাদের বিপদে পড়তে হবে বলে যে ধারণা করা হয়, তা খণ্ডনের জন্য আমরা দুটি জিনিস প্রমাণ করব। এক, তাদের সাথে মৈত্রী স্থাপন করলেও বিপদ থেকে বাঁচা যাবে না, বরং আরো বেশী বিপদে পড়তে হবে। দুই, তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করলেও সেটা আমাদের জন্য কোন বিপদের কারণ হবে না, বরং শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয় লাভের মাধ্যমে যাবতীয় বিপদাশঙ্কা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে, মুসলমানদের জান, মাল ও ইজ্জতের নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে। কাফেরদের সাথে মোকাবেলার মাঝেই আল্লাহ মুসলমানদের নিরাপত্তার বিধান নির্ধারিত রেখেছেন, তাদের মন রক্ষা করে চলার মাঝে নয়। আর তাদেরকে খুশী করা আমাদের পক্ষে সম্ভবও নয়। এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, "ইহুদী ও খ্রীস্টানরা কখনোই তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না, যে পর্যন্ত না তুমি তাদের ধর্মের অনুসরণ কর। বলে দাও, আল্লাহর দেখানো পথই হেদায়েতের পথ। আর তোমার কাছে যে জ্ঞান দেয়া হয়েছে তারপর যদি তুমিও তাদের অনুসরণ কর, তবে আল্লাহর কাছ থেকে তোমার জন্য কোন উদ্ধারকারী ও সাহায্যকারী নেই।" (সুরা বাকারাঃ১২০) সুতরাং আমরা যদি নিজেদের কলিজা বের করেও তাদের সামনে পরিবেশন করি, তবুও তারা আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবে না। অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, মুসলমানদের মধ্যে যারা কাফেরদের প্রতি সবচেয়ে বেশি ভয়, ভালবাসা, বিশ্বাস, অনুরাগ ও দুর্বলতা পোষণ করে, তারাই সর্বাধিক শোষণ ও নিষ্ঠুরতার শিকার হয়। যারা সর্বদা সমীহ করে চলে, তাদের সাথেই শত্রুরা সামান্য অযুহাতে বিবাদে লিপ্ত হয়। পক্ষান্তরে যারা ঈমানের বলে বলীয়ান হয়ে প্রয়োজনীয় কঠোরতা প্রদর্শন করতে পারে, তাদের উপর দুশমন সহজে হামলা করতে পারে না; পারলেও পরাজিত করতে পারে না। অথচ আমরা আজ ইহুদীদের একটু খুশী করার জন্য শান্তির মরীচিকার পিছনে ছুটে মরছি। তারা প্রতিদিন আমাদের রক্তপাত ঘটাচ্ছে, বাড়িঘর ভাঙছে, কিন্তু এসব কিছুই আমাদের শান্তি আলোচনার উপর কোন প্রভাব ফেলে না। নেতানিয়াহুর আমলে জনৈক ইসরাইলী মন্ত্রী বলেছিলেন, "ফিলিস্তিনী কর্তৃপক্ষের গৃহীত পদক্ষেপে আমরা সন্তুষ্ট নই।" তার উক্তি থেকে এ কোরআনী সত্যটিই প্রমাণিত হয় যে, তাদের ধর্ম গ্রহণ না করা পর্যন্ত তারা খুশী হবে না। আল্লাহ আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন, "বস্তুতঃ তারা তো সর্বদাই তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকবে, যাতে করে তোমাদেরকে দ্বীন থেকে ফিরিয়ে দিতে পারে, যদি তা সম্ভব হয়। তোমাদের মধ্যে যারা নিজের দ্বীন থেকে ফিরে দাঁড়াবে এবং কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের যাবতীয় আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে।" (সুরা বাকারা) তদুপরি আমরা সত্য ধর্ম পরিত্যাগ করলেও তারা আমাদের ছেড়ে দেবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের বাতিল ধর্ম ও কুৎসিত জীবনাদর্শ পুরোপুরি গ্রহণ না করি। আবার তাদের ধর্ম গ্রহণ করলেও ক্ষমা করবে না, যতক্ষণ স্বধর্ম ত্যাগ না করি। আমরা শয়তানের আনুগত্য করলেই সে তাতে খুশী হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর আনুগত্য সম্পূর্ণ বর্জন না করি। আল্লাহ তাআলার আনুগত্য তো দূরের কথা, দয়াময় আল্লাহর প্রতি সামান্য ভালবাসাকেও শয়তান বরদাশত করবে না। ইহুদী-খৃস্টানদের ধর্ম গ্রহণ করা ছাড়া অন্য কিছুতেই তারা সন্তুষ্টও হবে না, আমাদের প্রতি অণুমাত্র সহানুভূতিও দেখাবে না। মোটকথা, তারা সর্বাবস্থায়ই আমাদের প্রতি শত্রুতা অব্যাহত রাখবে। আমরা পুরোপুরি তাদের ধর্মে না যাওয়া পর্যন্ত কোন অবস্থাতেই তারা আমাদেরকে বিপদ বা দুর্ঘটনা থেকে রেহাই দেবে না। দয়াময় আল্লাহ আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, আল্লাহর দেখানো পথই হেদায়েতের পথ। উল্লেখ্য, আমরা সুরা ফাতেহায় আমাদের মহান রবের কাছে হেদায়েতের পথ প্রার্থনা করেছি এবং অভিশপ্ত ও বিপথগামীদের অনুসরণ থেকে আশ্রয় চেয়েছি। তাই ইহুদী-খৃস্টানদের আইন-কানুন ও দিকনির্দেশনা পরিহার করে আল্লাহর বিধান অনুসারে রাষ্ট্র ও সমাজ জীবন পরিচালনা করাই আমাদের কর্তব্য। আল্লাহ পাক বলেন, "আল্লাহ যদি তোমাদের সাহায্য করেন তাহলে কোন শক্তি তোমাদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে পারবে না। আর তিনি যদি তোমাদের পরিত্যাগ করেন, তাহলে এরপর কে আছে তোমাদের সাহায্য করার মত? কাজেই প্রকৃত মুমিনদের আল্লাহর উপরই ভরসা করা উচিত।" (সুরা আল ইমরানঃ১৬০) কাজেই দুর্ঘটনা থেকে বাঁচার জন্য কাফেরদের করুণা নয়, বরং আল্লাহর করুণাই কাম্য। আল্লাহকে রাজি রাখব, কিন্তু শয়তানকে বেজার করব না এমনটি অসম্ভব। আল্লাহর সেবকদের পক্ষে শয়তানের অনুসারীদের স্বাদ-আহলাদ ও আশা-আকাঙ্ক্ষা পুরণ করা সম্ভব নয়। কারণ, আমাদের ঈমান বিসর্জন দেয়া ছাড়া ওরা তুষ্ট হবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন, "হে লোকেরা; তোমাদের খোদার তরফ থেকে তোমাদের প্রতি যা কিছু নাযিল করা হয়েছে তা মেনে চল এবং নিজেদের রবকে বাদ দিয়ে অপরাপর পৃষ্ঠপোষকদের অনুসরণ করো না- কিন্তু তোমরা নসিহত খুব কমই মেনে থাক।" (সুরা আরাফঃ৩) প্রকৃতপক্ষে ইহুদী-খ্রীস্টানদের সাথে মেলামেশা বন্ধ করলে সেজন্য দুর্ঘটনায় পড়তে হয় না, বরং তাদের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখাটাই বিপদের কারণ হয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ পাকের সতর্কবাণীঃ এ জালেমদের দিকে মোটেই ঝুঁকবে না, অন্যথায় আগুন তোমাদের স্পর্শ করবে এবং তোমরা এমন কোন পৃষ্ঠপোষক পাবে না যে আল্লাহর হাত থেকে তোমাদের রক্ষা করতে পারে আর কোথাও থেকে তোমাদের কাছে কোন সাহায্য পৌঁছবে না। (সুরা হুদঃ১১৩)

যখন রাসুলুল্লাহ (সাঃ) কাফেরদের বিরুদ্ধে মক্কা অভিযানের জন্য গোপনে প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, তখন হাতেব ইবনে আবী বালতায়া (রাঃ) নামক জনৈক মুহাজির সাহাবী চিন্তা করলেন যে, মক্কায় অবস্থানরত তাঁর সন্তান-সন্ততিকে নির্যাতন থেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য কেউ নেই। অতএব, মক্কাবাসীদের প্রতি কিছু অনুগ্রহ প্রদর্শন করলে তারা হয়তো তাঁর সন্তানদের উপর জুলুম করবে না। হাতেব স্বস্থানে নিশ্চিত বিশ্বাসী ছিলেন যে, রাসুলুল্লাহ (সাঃ)-কে আল্লাহ তাআলা বিজয় দান করবেন। এই তথ্য ফাঁস করে দিলে তাঁর কিংবা ইসলামের কোন ক্ষতি হবে না। তিনি ভাবলেন, আমি যদি পত্র লিখে মক্কার কাফেরদেরকে জানিয়ে দেই যে, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) তোমাদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার ইচ্ছা রাখেন, তবে আমার ছেলে-পেলেদের হেফাজত হয়ে যাবে। হাতেবের এই উদ্যোগের কথা আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে ওহীর মাধ্যমে জানতে পেরে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) কয়েকজন সাহাবীকে পাঠিয়ে উক্ত পত্রটি বাহকের কাছ থেকে উদ্ধার করান। হাতেব (রাঃ) বদরী সাহাবী হবার উছিলায় দয়াময় আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রাপ্ত হন। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়ঃ-

BLACK ICE
SOFTWARE INC.
Driver Demo

মুমিনগণ, তোমরা আমার ও তোমাদের শত্রুদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তোমরা তো তাদের কাছে বন্ধুত্বের বার্তা পাঠাও, অথচ তারা যে সত্য তোমাদের কাছে আগমন করেছে, তা অস্বীকার করেছে। তারা রাসুলকে ও তোমাদেরকে বহিষ্কার করে এই অপরাধে যে, তোমরা তোমাদের রব আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখ। যদি তোমরা আমার সন্তুষ্টি লাভের জন্যে এবং আমার পথে জিহাদ করার জন্যে বের হয়ে থাক, তবে কেন তাদের প্রতি গোপনে বন্ধুত্বের পয়গাম প্রেরণ করছ? তোমরা যা গোপন কর এবং যা প্রকাশ কর, তা আমি খুব জানি। তোমাদের মধ্যে যে এটা করে, সে সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়। তোমাদেরকে করতলগত করতে পারলে তারা তোমাদের শত্রু হয়ে যাবে এবং মন্দ উদ্দেশ্যে তোমাদের প্রতি বাহু ও রসনা প্রসারিত করবে এবং চাইবে যে, কোনরূপে তোমরাও কাফের হয়ে যাও। তোমাদের স্বজন-পরিজন ও সন্তান-সন্ততি কিয়ামতের দিন কোন উপকারে আসবে না। তিনি তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করবেন। তোমরা যা কর, আল্লাহ তা দেখেন। তোমাদের জন্যে ইব্রাহীম ও তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে চমৎকার আদর্শ রয়েছে। তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিলঃ তোমাদের সাথে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের এবাদত কর, তার সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদের মানি না। তোমরা এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করলে তোমাদের ও আমাদের মধ্যে চিরশত্রুতা থাকবে। কিন্তু পিতার উদ্দেশ্যে ইব্রাহীমের উক্তি এই আদর্শের ব্যতিক্রম। তিনি বলেছিলেনঃ আমি অবশ্যই তোমার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করব। তোমার উপকারের জন্য আল্লাহর কাছে আমার আর কিছুই করার নেই। হে আমাদের রব! আমরা তোমারই উপর ভরসা করছি, তোমারই দিকে মুখ করছি এবং তোমারই নিকট আমাদের প্রত্যাবর্তন। হে আমাদের রব! তুমি আমাদেরকে কাফেরদের জন্য পরীক্ষার পাত্র করো না। হে আমাদের রব! আমাদেরকে ক্ষমা কর। নিশ্চয় তুমি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। তোমরা যারা আল্লাহ ও পরকাল প্রত্যাশা কর, তোমাদের জন্য তাদের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে। আর যে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার জানা উচিত যে, আল্লাহ বেপরওয়া, প্রশংসার মালিক। (সুরা মুমতাহিনাঃ ১-৬)

এখানে ১ম আয়াতের শুরুতে কাফের শব্দ বাদ দিয়ে "আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রু" বলে এই নির্দেশের কারণ ও দলিল ব্যক্ত করা হয়েছে যে, নিজেদের ও আল্লাহর শত্রুর কাছে বন্ধুত্ব আশা করা আত্মপ্রবঞ্চনা বৈ নয়। কাফেরদের আসল শত্রুতা হল স্বয়ং আল্লাহ পাকের সাথে। আমরা যেহেতু আল্লাহর পক্ষে, তাই তারা আমাদের সাথেও শত্রুতা পোষণ করে। তারা মুলতঃ আল্লাহর উপর রাগটাই ঝাড়তে চায় আমাদের শিশু-বৃদ্ধ নির্বিশেষে আল্লাহর নিরীহ বান্দাদের উপর। তারা যেখানে শত্রু-মিত্র নির্ধারণের মুলনীতি থেকে একবিন্দু নড়তে রাজি নয়, সেখানে আমরা আমাদের মুলনীতি ভুলে গিয়ে তাদের দিকে বন্ধুত্বের হাত বাড়াতে যাই কোন যুক্তিতে? এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা আক্ষেপ প্রকাশ করে বলেছেন যে, একদিকে তোমরা তাদের দিকে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছ, অপরদিকে তোমাদের প্রতি তাদের আচরণ মোটেই সন্তোষজনক নয়। তারা নিজেরা তো তোমাদের কাছে আনীত সত্য তথা আল্লাহর কালামকে প্রত্যাখ্যান করেছে, তদুপরি তোমরা আল্লাহর এই সত্য দ্বীনকে গ্রহণ করায় তোমাদেরকেও মাতৃভুমি থেকে উচ্ছেদ করেছে। কাফেরদের বহিষ্কার প্রক্রিয়াটিও যদি শান্তিপূর্ণভাবে হত, তাহলেও একটা কথা ছিল। কিন্তু তারা রাসুলুল্লাহ (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরামের উপর যে চরম নিষ্ঠুরতা অবলম্বন করেছিল, তা মানব ইতিহাসে নজীরবিহীন। তখন মুসলমানদের কিছু বলারও উপায় ছিল না। কারণ, নিজের অধীনস্ত ব্যক্তির উপর জুলুম করাটা ছিল সমাজ-স্বীকৃত বৈধ কাজ। হযরত বেলালের (রাঃ) দুর্দশার কথা আমাদের অজানা নয়। হযরত আবুবকর (রাঃ) উমাইয়ার কাছে বললেন, "ভাই, একটা মানুষকে এভাবে মারা কি ঠিক হচ্ছে?" কিন্তু অহংকারী ব্যক্তি, যে নিজেকেই খোদা মনে করে, সে এমন ভাব দেখায় যেন তার অনুমতি ছাড়া কেউ তার কাছে সুপারিশও করতে পারবে না। দাম্ভিক উমাইয়ার তাৎক্ষণিক জবাব, "গোলাম আমার। আমি যখন ইচ্ছা মারব, যখন ইচ্ছা আদর করব।" তার এই মনোভাব মুলতঃ নমরূদের খোদাগিরি প্রদর্শনের কথাই আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়। উল্লেখ্য, নমরূদ দেখাতে চেয়েছিল সে যাকে ইচ্ছা মুক্তি দেয়, আর যাকে ইচ্ছা প্রাণদণ্ড দেয়। উমাইয়া আরো বলেছিল, "তোমরাই তো ওকে নষ্ট করেছো।" অবশ্য পণের টাকার আপেক্ষিক গুরুত্ব কিঞ্চিত উপরে থাকায় হযরত বেলাল আল্লাহর রহমতে মুক্তিলাভ করেন। যাহোক, আল্লাহ তাআলা বহিষ্কারের ঘটনার উল্লেখ করে মুলতঃ কাফেরদের অতীত ভুমিকার কথাই স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, তখন তোমাদের আর্তনাদ যাদের মন গলাতে পারেনি, তখন কারো কোন অনুরোধে যারা তোমাদের খাতির করেনি, তারা এখন কিভাবে তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করবে? চলমান আয়াতে এরপর আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে যে, তোমাদের জিহাদ যদি আল্লাহর জন্য হয়ে থাকে, তাহলে তোমাদের একমাত্র আল্লাহকেই সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করা উচিত, আল্লাহর শত্রুকে নয়। মক্কী জিন্দেগিতেও তো তারা তোমাদের হত্যার চেষ্টা কম করেনি। তখন দয়াময় আল্লাহই স্বীয় কুদরতে তোমাদের হেফাজত করেছেন। কাজেই আজও যদি নিজে বাঁচতে চাও, পরিবার-পরিজনকে বাঁচাতে চাও, তা কেবল আল্লাহর দয়াতেই সম্ভব, কোন কাফেরের দয়ায় নয়। কারণ, জীবন-মরণের মালিক একমাত্র সর্বশক্তিমান আল্লাহ। যারা আমাদের রাসুলকে অতীতে হত্যার চেষ্টা ও বর্তমানে অবমাননা করেছে, আমাদের ফিলিস্তিনী ভাইদের কেবল মুসলমান হবার অপরাধে ঘরবাড়ি থেকে বহিষ্কার করছে, আমরা তাদের সাথেই গোপনে ও প্রকাশ্যে বন্ধুত্বের পয়গাম বিনিময় করে চলেছি বছরের পর বছর। আলোচ্য আয়াতের শেষাংশে আলেমুল গায়েব আল্লাহ তাআলা আমাদের যাবতীয় গোপন ও প্রকাশ্য কথাবার্তা ও কার্যকলাপ সম্পর্কে নিজের অবহিতির কথা জানিয়ে দিয়েছেন। অপর এক সুরায় আল্লাহ পাক বলেন, "তিন ব্যক্তির এমন কোন পরামর্শ হয় না যাতে তিনি চতুর্থ না থাকেন এবং পাঁচ জনেরও হয় না যাতে তিনি ষষ্ঠ না থাকেন।" (মুজদালাহ)

সুরা মুমতাহিনার দ্বিতীয় আয়াতের শুরুতে মহাজ্ঞানী আল্লাহ আমাদেরকে সতর্ক সংকেত দিতে গিয়ে বলেন, "তোমাদেরকে করতলগত করতে পারলে তারা তোমাদের শত্রু হয়ে যাবে।" অর্থাৎ, সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও তারা তোমাদের সাথে উদার ব্যবহার করবে, তাদের কাছে এরূপ প্রত্যাশা করা দুরাশা মাত্র। এখানে হাতেব (রাঃ)-কে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, তোমরা শয়তানদের সাথে যতই সদ্ভাব কর না কেন, তারা কিছুতেই তোমাদের আপনজনদের প্রতি সদয় হবে না। কেননা যারা আল্লাহর দ্বীনকে অস্বীকারের মাধ্যমে দয়াময় আল্লাহর প্রতিই অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে, তারা মানুষের কাছে কৃতজ্ঞ হয়ে 'অনুরোধে ঢেঁকি গিলতে' যাবে কোন দুঃখে? কাফেররা যেকোন ধরনের খেদমত বা উপকারের প্রতিদান কেবল নিমকহারামীর মাধ্যমেই প্রদান করবে, কৃতজ্ঞতার মাধ্যমে নয়। হাতেবের (রাঃ) বন্ধুত্বের বার্তা যদি কাফেরদের নিকট পৌঁছে যায়, তাহলে এতে করে তাঁর মানসিক ও বৈষয়িক দুর্বলতা এবং অসহায়ত্বই তাদের কাছে প্রকাশিত হয়ে

পড়বে। তিনি যে আপন সন্তানদের নিরাপত্তার জন্য ওদের দয়ার উপর নির্ভরশীল এটাই ওরা জেনে যাবে। তদুপরি আক্রমণের কথা আগেভাগে জানতে পারলে সম্ভাব্য আক্রমণের মোকাবেলায় মক্কাবাসী মুসলমানদেরকে জিম্মি হিসেবে ব্যবহার করাটাও কাফেরদের পক্ষে সহজ হয়ে যেত। আপনজনের ভাগ্যকে দুশমনের হাতে সোপর্দ করে দেয়া চরম অদুরদর্শিতার পরিচায়ক। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ভারতীয় মুসলমানরা মিত্রশক্তির পক্ষে জার্মানীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে এই আশায় যে, এই আনুগত্য ও সহযোগিতার বিনিময়ে তুরস্কের অখণ্ডতা বজায় রাখা হবে। ফলাফল কি হয়েছে আমাদের সকলের জানা। মোটকথা, আমাদেরকে ধরতে পারলে আমাদের কোন সাহায্য-সহযোগিতার কথাই তারা মনে রাখবে না। আমাদের কে কট্টরপন্থী, কে উদারপন্থী; কে মৌলবাদী, কে প্রগতিবাদী; কে বিদ্রোহী, কে অনুগত; কে সামরিক, কে বেসামরিক এসব তারা বিবেচনায় আনবে না- বরং পাইকারী দরে ক্লিন সেভ করবে। ভারতের মুশরিক শাসকেরা স্বদেশী মুসলমানদেরকে হাতের মুঠোয় পেয়ে তাদের উপর ইচ্ছেমত মনের ঝাল মেটাচ্ছে, আমাদেরকে এখনো হাতের মুঠোয় পায়নি বলে আমাদের সাথে সদাচরণ করছে এবং আমরা কেউ তাদের দেশ সফরে গেলে আমাদের উপস্থিতিতে স্থানীয় মুসলমানদের প্রতিও তুলনামুলকভাবে সংযত ভাব দেখাচ্ছে। কিন্তু আমাদেরকে যখন হাতের মুঠোয় পাবে, তখনই সকল সদ্ব্যবহারের আসল রহস্য প্রকাশিত হবে। রাশিয়ানরা বিদেশী মুসলিম ছাত্রদের বৃত্তি দিয়ে নিয়ে তাদের সাথে একেবারে পিতামাতার মত আচরণ করলেও পরে যখন মুসলিম দেশে সামরিক আগ্রাসন চালায়, তখন আর কোন দয়া দেখানো হয় না। আল কুরআনে অন্যত্র এরশাদ হয়েছে, "কিরূপে? তারা তোমাদের উপর জয়ী হলে তোমাদের আত্মীয়তার ও অঙ্গীকারের কোন মর্যাদা রাখবে না। তারা মুখে তোমাদের সন্তুষ্ট করে, কিন্তু তাদের অন্তরসমুহ তা অস্বীকার করে, আর তাদের অধিকাংশই ফাসেক।" (সুরা তওবাঃ৮) অতএব, যে ভারত সরকার নিজের অধীনস্ত মুসলিম নাগরিকদের প্রতিই দয়া দেখাতে জানে না, সেই ব্রাহ্মণ্যবাদী জান্তা আমাদেরকে কেবল প্রতিবেশী হবার খাতিরে ছেড়ে দেবে; এমনটি আশা করাও পাপ। যারা ভারতীয় বাঙ্গালী মুসলমানদেরই বাংলাদেশী বলে তাড়িয়ে দেয়, তারা বাংলাদেশী মুসলমানদেরকে বাঙ্গালী বলে গ্রহণ করবে কিভাবে? যাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন যে তারা আত্মীয়তার ব্যাপারেও খাতির করবে না, আদর্শিক পার্থক্যের কাছে যেখানে আত্মীয়তার সম্পর্কও পরাজিত, সেখানে কেবল ভাষার সাদৃশ্য কিভাবে ইসলাম ও কুফরের ভেদাভেদ মিটিয়ে দিয়ে কাফেরদেরকে মুসলমানদের প্রতি সহনশীল করে তুলবে? গুজরাল, বাজপেয়ী বা আদভানী এদের কারো সাথে যদি আমাদের রক্ত সম্পর্কও থাকত, তবুও আমাদের প্রতি তাদের রক্ত পিপাসায় এতটুকু ঘাটতি দেখা যেত না। কেননা কাফের কোনদিন মুসলমানের প্রতি স্নেহশীল হতে পারে না, যত বড় ঘনিষ্ঠতমই হোক না কেন। কাফেররা যদি শয়তানের আদেশে আত্মীয়তার মর্যাদাকে পর্যন্ত ভুলুণ্ঠিত করতে পারে, তাহলে আমরা কোন দুঃখে ওদের সাথে সম্পর্কের খাতিরে আল্লাহর আদেশ লংঘন করে নিজেদের জন্য গযব ডেকে আনতে যাব? আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার পাশাপাশি ওয়াদা খেলাপ করাও কাফেরদের ধর্ম। ভারতীয় হিন্দুদের মধ্যে যে গোষ্ঠীটি আমাদের প্রতি সর্বাধিক উগ্র মনোভাবাপন্ন হিসেবে পরিচিত, সে চক্রই নির্বাচনের প্রাক্কালে আমাদের প্রতি সবচেয়ে অধিক সহানুভূতি প্রদর্শন করে। এরা স্থান, কাল ও পাত্রভেদে রূপ-চেহারা পরিবর্তনে অভ্যস্ত। মুসলিম-নির্মুলের শ্লোগান বাদ দিয়ে বিজেপি এক পর্যায়ে মুসলমানদের অধিকার প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার নিয়ে আবির্ভূত হয়। যে আদভানি আমাদের মসজিদ ভেঙ্গেছে, আমাদের সহস্র ভাইকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছে, হাজারো মুসলিম নারীর সম্ভ্রম কেড়ে নিয়েছে, সেই আদভানি শেষ পর্যন্ত মুসলমানদের কাছেই নির্লজ্জভাবে ভোট চাইতে আসে। কাফের-মুনাফিকদের যাবতীয় নম্র ব্যবহার, কোমলতা, সহানুভূতি, সমবেদনা, সরল ভাবভঙ্গি আর আদর-যত্ন যে স্রেফ অভিনয়; তার প্রমাণসরূপ অন্তর্যামী আল্লাহ পাক বলেন, "তারা মুখে তোমাদের সন্তুষ্ট করে, কিন্তু তাদের অন্তরসমুহ তা অস্বীকার করে।" এরা সারাটা যুগ ধরে সীমাহীন পাশবিকতা চালিয়ে একদিন মুসলিম যুবকদের বিভ্রান্ত করার জন্য যুব সম্মেলনে হাজির হয়। মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে আদভানি গংরা বড় বড় মুসলিম নেতাকে বুঝ দিয়ে নিজেদের দলে ভেড়াতে সক্ষম হয়। তারপর ক্ষমতায় এসে সকল মুসলমানকে পাকিস্তানী চর বানিয়ে তাদের উপর পাইকারীভাবে বর্বরতা চালানো হয়। পরবর্তীতে আবার ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর নির্বাচনকে সামনে রেখে তাদের প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ী হজ্জ সম্মেলনে উপস্থিত হয়। মুনাফিক সে-ই, যে রাতভর মানুষের উপর পাশবিক নির্যাতন চালিয়ে সকালে এসে জনগণের সামনে মধুর স্বরে কথা বলে। কাফেররা নিজেরা যেমন মুসলমানদের সাথে লোক দেখানো সদ্ব্যবহার করে, তেমনি মুসলমানদের আন্তরিক সদাচরণকেও তারা অবমুল্যায়ন করে। মুসলমানদের যেকোন উদারতাকে তারা দুর্বলতা ও কপটতা বলেই গণ্য করে এবং মুসলমানদের ভালবাসা ও আন্তরিকতাকে কটাক্ষ করে। অপরদিকে মুসলমানরা নিজেরা আন্তরিক বলে শত্রুকেও আন্তরিক বলে মনে করে। কাফেররা মুসলমানদের প্রতি তাদের মনোভাব কোথাও প্রকাশ করে, আবার কোথাও গোপন রাখে। তারা মাঝে মধ্যে মুসলমানদের প্রতি সমর্থন, সহানুভূতি, ভালবাসা ও স্নেহশীলতা প্রদর্শন করলেও তাদের প্রতিহিংসামুলক মনোভাব পরিবর্তিত হয় না। মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহঃ) বলেন, "বর্তমান পাশ্চাত্য 'ডিপ্লোমেসি' অনুসারে মুখে মুখে সন্ধি ও অনাক্রমণের চুক্তি দৃঢ় করা আর গোপনে সৈন্য পরিচালনা করা ইসলামের দৃষ্টিতে নিকৃষ্টতম মুনাফেকী ছাড়া আর কিছুই নয়।" (ইসলামী রাজনীতির ভুমিকা) শুধু তাই নয়, উপরে উপরে জুলুমের অবসান ও স্নেহের সুচনা দেখিয়ে তলে তলে আরো বহুগুণ অধিক মাত্রায় বর্বরতা চালিয়ে যাওয়াটাও মুনাফিকের এক গুরুত্বপুর্ণ পলিসি। অতএব, রোহিঙ্গা মুসলমানরা কেমন আছে সে ব্যাপারে বার্মার প্রতিনিধিদের মুখে কোন সান্ত্বনার বাণী শুনলে তাতে আশান্বিত হবার সুযোগ নেই। কারণ, বর্মী জান্তা যদি সত্যবাদী ও বিশ্বস্তই হতো, তাহলে তো আর কোন চিন্তার কারণই ছিল না। নিরাপত্তার নিশ্চয়তা পেয়ে ফিরে গিয়ে রোহিঙ্গারা সাথে সাথেই আবার বর্বরতার শিকার হয়। আদভানি বাবু অঙ্গীকার করেছিলেন যে, বাবরী মসজিদ ঘটনার পুনরাবৃত্তি হবে না। অথচ তিনি কাবাঘরে পর্যন্ত মুর্তি পুনঃস্থাপনের বাসনা এখনো অন্তরে দৃঢ়ভাবে পোষণ করেন। আর গুজরাটে তারা সম্প্রতি যে কাণ্ড ঘটিয়েছেন, তা বাবরী মসজিদের ঘটনাকে ম্লান করে দেয়। বিজেপির বি টিম হিসেবে পরিচিত শিবসেনার নেতা বল থ্যাকারে একবার বলেছিলেন, "ভারতীয় সৈন্যদের উচিত মুসলিম নারীদের ধর্ষণ করা।" কাজেই উগ্র হিন্দু নেতারা নির্বাচনকালে সময়ের প্রয়োজনে মুসলমানদের মন ভোলানোর জন্য যত সুন্দর কথাই বলুন না কেন, ক্ষমতাসীন হবার সাথে সাথে তারা সকল অঙ্গীকারের কথা গঙ্গাজলে ফেলে দিয়ে উল্লিখিত 'উচিত কর্মটি' বাস্তবায়নে মনোনিবেশ করেন। ভারতের অভ্যন্তরে দলীয় ক্যাডারদের দ্বারা এবং কাশীর ও বাংলাদেশ সীমান্তে সামরিক বাহিনীর দ্বারা উক্ত প্রকল্পটি সম্পাদিত হয়। বাঙ্গালী

BLACK ICE
SOFTWARE INC.
Driver Demo

জাতীয়তাবাদের নামে দুই বাংলা এক করার শ্লোগান দিয়ে নানা প্রলোভন দেখিয়ে আমাদেরকেও তাদের শাসনাধীনে চলে আসার আমন্ত্রণ জানানো হচেছ। তাদের ডাকে সাড়া দিলে আমাদেরকেও একই প্রতারণার শিকার হতে হবে। স্বয়ং আল্লাহই যখন বলে দিয়েছেন যে, তাদের অধিকাংশই ফাসেক অর্থাৎ পাপী ও দুশ্চরিত্র- এখন আমাদের আর কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অবকাশ আছে কি? কলুষিত চরিত্রের মানুষের পাপাসক্ত হৃদয়ের মাঝে যে কোনপ্রকার আত্মীয়তার মায়া, কৃতজ্ঞতাবোধ বা অঙ্গীকার রক্ষার প্রেরণা স্থান পেতে পারে না, তা এক পরীক্ষিত সত্য। মুসলমানদের প্রতি কাফেরদের আচরণের ইতিহাস প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের ইতিহাস। ইংরেজরা বঙ্গভঙ্গ রদ ও তুর্কী খেলাফত উচেছদের মাধ্যমে ভারতীয় মুসলমানদের সাথে প্রতারণা করেছে। বর্তমানে ইরাকের সকল অস্ত্র ধ্বংস করে ফেলার পরও চুক্তি অনুযায়ী অবরোধ তুলে নেয়া তো দুরের কথা, বরং নিরস্ত্র অবস্থার সুযোগেই ইরাকের মুসলমানদের চূড়ান্তভাবে নির্মুল করা হয়েছে। নিকট অতীতে বসনিয়ার মুসলমানদের অস্ত্র সমর্পণের বিনিময়ে সার্বদের আক্রমণ বন্ধ এবং মুসলমানদের হেফাজতের দায়িত্ব জাতিসংঘ শান্তিরক্ষীদের গ্রহণের নিশ্চয়তা দিয়ে মুসলমানদের অস্ত্রগুলো কেড়ে নিয়ে জাতিসংঘ বাহিনী কেটে পড়ে এবং নিরস্ত্র মুসলমানরা সার্বীয় হত্যাযজ্ঞের শিকার হয়। রাজা ফার্ডিন্যান্ডের প্রতারণা ও রাণী ইসাবেলার মিষ্টি কথায় বিভ্রান্ত হয়ে স্পেনের মুসলমানরা যখন মসজিদে আশ্রয় নিয়েছিল, তখনই তারা এক ঐতিহাসিক ট্রাজেডির শিকার হয়। অতএব, পৃথিবীর কোন স্থানে কোন মুসলমান যেন কোন কাফেরের প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করে আত্মসমর্পণ না করে। একবার যদি কেউ কোন কাফেরের করায়ত্ত হয়ে যায়, তখন আর প্রাণ ভিক্ষা চেয়ে কোন লাভ হবে না। কেননা জালেমরা তাদের জুলুমের পথে অটল থাকতেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। মজলুম মুসলমানের কাকুতি-মিনতি কেবল জালেমের মনোবলকেই দ্বিগুণ করবে। অতএব, সময় থাকতেই প্রতিটি মুসলমানকে সতর্ক হওয়া উচিত, যেন কাউকে শত্রুর হাতে পড়তে না হয়। আর ইতিমধ্যে যারা শত্রুর কবলে পড়েই গেছে, তাদেরকে মুক্ত করার জন্যও কোন অনুরোধ-উপরোধ কাজে আসবে না; বরং বল প্রয়োগে বিধর্মী জালেমদের মাথা কেটে দেয়াটাই মজলুম মুসলমানদের উদ্ধারের একমাত্র পন্থা। আল্লাহ তাআলা বিশেষ করে ইহুদীদের সম্পর্কে বলেন, "তারা কোন মুমিনের সাথে আত্মীয়তা ও অঙ্গীকারের মর্যাদা রক্ষা করে না; আর তারাই সীমালঙ্ঘনকারী।" (তওবাঃ১০)

সুরা মুমতাহিনার আলোচ্য আয়াতে এরপর বলা হয়েছে, "এবং মন্দ উদ্দেশ্যে তোমাদের প্রতি বাহু ও রসনা প্রসারিত করবে।" অর্থাৎ, তারা হাত ও মুখের দ্বারা তোমাদের জান, মাল ও ইজ্জতের ক্ষতিসাধন করবে। হাতেব (রাঃ) নিজের পরিবার-পরিজনের ক্ষতি এড়ানোর জন্য কাফেরদের কাছে নিজেদের গোপন সামরিক তথ্য ফাঁস করতে চেয়েছিলেন। এজন্য আল্লাহ তাআলা আমাদের জানিয়ে দিলেন যে, তারা সুযোগ পেলে মুসলমানদের জীবন ও সম্ভ্রমের উপর ছোবল মারবেই। বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বন্দী মুজাহিদদের হুমকি দেয়া হয় যে, সামরিক তথ্য না দিলে পরিবার-পরিজনের প্রাণ ও সম্মান কেড়ে নেয়া হবে। কিন্তু আসলে তারা মুসলমানদের হাতের মুঠোয় পেলে খুন, ধর্ষণ, লুণ্ঠন, নির্যাতন কিছুই বাকি রাখবে না। হাতের দ্বারা না পারলে মুখের দ্বারা ঝাল মেটানোর চেষ্টা করবে। অবশ্য পরিবার-পরিজনের অবস্থান শত্রু নিয়ন্ত্রিত এলাকায় হলে শত্রু সৈন্যের জেরার মুখে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করাটাই সমীচীন। কিন্তু নিজেরাই আগ বাড়িয়ে গায়ে পড়ে শত্রুর কাছে তথ্য পাচার করতে যাওয়া চরম নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। অতএব, যাদের হাতে পড়লে আমাদের সর্বস্ব খোয়াতে হবে, তাদের হাত শক্তিশালী হয় এমন কিছু যেন আমরা না করি। আমাদের বরং তাদের হাতকেই শক্তিশালী করা উচিত, যারা আমাদের উপর থেকে আগ্রাসী শত্রুর কালো হাতকে সরিয়ে দিতে আমাদের পাশে এসে দাঁড়াবে। কুফরী শক্তির হাত যেমন আমাদের ধ্বংসের জন্য সদা উদ্যত, তেমনি তাদের জিহবার অনিষ্ট থেকেও আমরা মোটেই নিরাপদ নই। মুখ খারাপ তারা এমনিতেই করবে। যার গোটা অস্তিত্বটাই অপবিত্র, তার মুখ কিছুতেই পবিত্র বানানো যাবে না। আমরা শত তোয়াজ করে চললেও তাদের মুখ দিয়ে মধু ঝরাতে পারব না। একমাত্র ধোঁকাবাজির উদ্দেশ্য ছাড়া তাদের মুখ দিয়ে হীরেমোতি ফুল বের হতে পারে না। কুকুরের মুখের সামনে থেকে পায়খানা সরিয়ে নেয়া হলে পরে স্বাভাবিকভাবেই কুকুরের ক্রুদ্ধ বিষদাঁত মানুষের দিকে মরণ কামড় হানতে উদ্যত হয়। এমতাবস্থায় কামড়ের হাত থেকে নিরপরাধ মানুষকে বাঁচাতে চাওয়ার অপরাধে কুকুরই যদি মানুষকে কুত্তা বলে গালি দেয়, তাতে মানুষের লজ্জায় মুখ লুকাবার কোন কারণ নেই। অতএব, যাদের বদ মতলবের কথা কোরআন দ্বারা প্রমাণিত, যাদের দিলে নেক মকসুদ পয়দা হওয়ার ক্ষীণতম সম্ভাবনা নেই, তাদের নিয়তকে ভাল মনে করে আমরা যেন সর্বনাশে পতিত না হই।

পরিশেষে আল্লাহ তাআলা খোদাদ্রোহী চক্রের বর্বরতার আসল উদ্দেশ্যটি খোলাসা করে দিয়েছেন, "এবং চাইবে যে, কোনরূপে তোমরাও কাফের হয়ে যাও।" অর্থাৎ, কাফেরদের যাবতীয় শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন কিংবা যৌন নিপীড়ন সবকিছুর লক্ষ্য একটাই- তাহল, আমাদেরকে ধর্মচ্যুত করা। মুসলমানদেরকে কেবল ইসলাম ত্যাগে বাধ্য করার জন্যই মক্কার কাফেররা জ্বলন্ত অঙ্গার দিয়ে চামড়া ও মাংস ঝলসে দিত। হযরত বেলালকে মুশরিকরা বলত, "তুমি আমাদের কথিত শব্দগুলোই উচ্চারণ কর।" বেলাল (রাঃ) বলতেন, "আমার যবান ঠিকমত তোমাদের শব্দগুলো উচ্চারণ করতে পারে না।" বর্তমানে বসনিয়া ও কাশ্মীরে যথাক্রমে সার্ব ও ভারতীয় সৈন্যরা মুসলিম নারীদের ধর্ষণ করছে মুলতঃ তাদের ঈমান নষ্ট করার জন্যই। পবিত্রতা যেহেতু ঈমানের অঙ্গ, তাই আমাদের পবিত্রতাই ওদের এক নম্বর টার্গেট। ইংরেজরা বেশ্যাপ্রথা চালুর মাধ্যমে নিরীহ মেয়েদের ধরে নিয়ে ইসলামবিরোধী কাজে লিপ্ত করার যে ব্যবস্থা করে- সেখানেও আমাদের ধর্ম নষ্ট করা ছাড়া তাদের আর কোন উদ্দেশ্য ছিল না। সুরা বাকারার ১০৯ নং আয়াতের শুরুতে মহান আল্লাহ বলেন, "আহলে কিতাবদের অনেকেই প্রতিহিংসাবশতঃ চায় যে, মুসলমান হওয়ার পর তোমাদেরকে কোন রকমে কাফের বানিয়ে দেয়।" এখন কথা হচ্ছে কি সেই প্রতিহিংসা? আখেরী নবীর আবির্ভাবের আগ পর্যন্ত ইহুদী-খ্রীস্টান মোল্লারা ধর্মের নামে মানুষকে প্রতারণা করে অর্থ ও প্রতিপত্তি লাভের যে ব্যবসা পাতিয়ে বসেছিল, সত্য ধর্মের আগমনে তাদের ভণ্ডামির মুখোশ উন্মোচন হওয়ায় তাদের সেই সমস্ত কারবার ভেস্তে যায়। সুদের ব্যবসার মাধ্যমে জনগণকে শোষণকারী ইহুদী পুঁজিপতিদেরও আঁতে ঘা লাগে। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের সময় ইহুদীরা তাদের নাশকতামুলক কার্যকলাপের কারণে বহিষ্কৃত হয়। আখতার ফারুক বলেন, "ইহুদীরা যেহেতু আল্লাহর অভিশাপে বানর হয়েছিল, তাই তারা আল্লাহর সকল বান্দাকেই বানর প্রমাণ করতে সচেষ্ট।" রাসুল (সাঃ) ও খলিফাদের সময় প্রায় সকল যুদ্ধেই রোমানরা পরাজিত হয় এবং পরবর্তীকালে বিভিন্ন ক্রুসেড যুদ্ধেও খৃস্টশক্তি চরমভাবে মার খায়। এছাড়া ইহুদী-খ্রীস্টানসহ পৃথিবীর

সকল কাফেরের মনেই ইসলামের উপর আক্রোশের একটি অভিন্ন কারণ রয়েছে তাহল ইসলাম তাদের লাগামহীন ও স্বেচ্ছাচারী জীবনযাপনের ঘোর বিরোধী। মক্কার কাফেরদের মুসলিম বিতাড়নের ক্ষেত্রেও এ কারণটিই ছিল সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। এ প্রসঙ্গে মাহমুদুল হাসান লিখেছেন, "ইসলাম ধর্ম নির্মল, নিষ্কলুষ, সাধু, সৎ, সরল, অনাড়ম্বর জীবনযাপনের প্রেরণা দেয়। ইসলামের এই অমোঘ বাণী বিধর্মীদের পাশবিক লালসা, পাপাচার, নারী নির্যাতন, ব্যভিচার, কুসীদ প্রথা, মদ্যপান, জুয়াখেলা, নরবলি প্রভৃতির মূলে কুঠারাঘাত করে। এই কারণেই কুরাইশগণ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উপর নির্যাতন ও উৎপীড়ন শুরু করে।" তিনি আরো বলেন, "জন্মভূমি মক্কা হইতে হযরতকে বিতাড়িত করিয়াই তাহারা ক্ষান্ত হয় নাই; বরং তাঁহাকে ও নব-প্রতিষ্ঠিত ইসলামকে সমূলে ধ্বংস করিবার জন্য তাহারা ষড়যন্ত্র ও যুদ্ধপ্রস্তুতি গ্রহণ করিতে থাকে।" নেশার কাজে বাধার সম্মুখীন হলে তাৎক্ষণিকভাবে ক্রোধ জাগ্রত হওয়াটা স্বাভাবিক। কিন্তু যদি তারই জের ধরে পরবর্তীতে নিত্য-নতুন অযুহাত তৈরি করে নিয়ে একের পর এক প্রতিশোধ নেয়া হয় এবং এ প্রতিশোধ গ্রহণের ধারা যদি অনির্দিষ্টকাল চলতে থাকে, তাহলে কোন নতজানু ভূমিকার দ্বারা সেই প্রতিশোধস্পৃহাকে চেক দেয়া সম্ভব নয়। সাম্প্রদায়িক প্রতিহিংসা কমবেশী সকলের মধ্যেই থাকে। তবে পার্থক্য হল, আমাদের প্রতিহিংসা কেবল অপরাধীদের বিরুদ্ধেই সীমাবদ্ধ; কিন্তু ওদের প্রতিহিংসা আমাদের শিশুদের উপরেও পরিব্যাপ্ত। আমরা মানুষকে মুসলমান বানাতে চাই অকল্যাণ থেকে বাঁচিয়ে কল্যাণ সাধনের জন্য, আর ওরা আমাদের কাফের বানাতে চায় অকল্যাণ সাধনের জন্য। কমুনিষ্টরা প্রয়োজনে পৃথিবীর তিন-চতুর্থাংশ মানুষকে হত্যা করে হলেও বাকি এক ভাগকে কমুনিষ্ট বানাতে বদ্ধপরিকর ছিল। শুধু কমুনিষ্ট কেন, যে কোন প্রতিহিংসাপরায়ণ কাফেরই এ ধরনের দানবীয় মনোভাব পোষণ করে। বিশেষ করে মুসলমানদের প্রতিই তারা সর্বাধিক কঠোর। আমাদেরকে পরাজিত করতে পারলে যেকোন ধরনের নিষ্ঠুর পন্থায় জোরপূর্বক কাফের বানানোর চেষ্টা চালাবে। কাজেই এমতাবস্থায় কুফরী শক্তির বাহুর হিংস্র থাবা ও রসনার বিষাক্ত ছোবল থেকে নিজেদের জান, মাল, ঈমান ও ইজ্জত হেফাজতের জন্য জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণ করাই এই মুহূর্তের প্রধান দাবী। মুসলিম উম্মাহর ধ্বংস অনিবার্য।

আমাদের শত্রুপক্ষের আচার-আচরণ, মনোভাব, অ্যাটিচুড, কার্যকলাপ ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে স্পষ্টভাবে জানার পর একটা সত্য আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে, শত্রুর দয়া নিয়ে কেউ প্রাণভিক্ষা লাভ করতে বা নির্যাতন-নিপীড়ন থেকে রেহাই পেতে পারে না, মুক্তি বা স্বাধীনতাও অর্জন করতে পারে না। ইসরাইলীরা কারাগার থেকে ফিলিস্তিনী বন্দীদের কেবল তখনই মুক্তি দেয়, যখন আর বেশিদিন বাঁচার সম্ভাবনা থাকে না; বরং বার্ধক্য, রোগ-ব্যাধি কিংবা বিষক্রিয়ার ফলে কিছুদিনের মধ্যেই মরে যাবে বলে নিশ্চিত হওয়া যায়। মাঝখান থেকে জালেমদের উদারতা ও মহানুভবতার কথাও প্রচার হয় এবং মজলুমকে জালেমের উদারতার কাছে কৃতজ্ঞ থাকার নসীহত আর খোঁটা শুনতে হয়। বসনিয়ায় সার্বরা ধর্ষিত মুসলিম নারীদের কেবল তখনই মুক্তি দিত, যখন তাদের গর্ভে সার্ব সন্তানের অস্তিত্ব নিশ্চিত হতো; যাতে তাদেরকে ও তাদের বংশধরদেরকে কলুষিত করা যায় এবং তারা আর সমাজের জন্য আশীর্বাদ না হয়ে ফেতনা, ফাসাদ, বিভেদ, সমস্যা ও অশান্তির কারণ হয়ে দাড়ায়। ইংরেজরা আমাদের তখনই স্বাধীনতা প্রদান করল, যখন তারা নিশ্চিত হল যে, আমরা তাদের মতই মাতাল ও জানোয়ার হতে পেরেছি। ইহুদী-খৃস্টান তথা কাফের-মুনাফিকরা আমাদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার কেবল তখনই দিতে পারে, যখন আমাদেরকে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগের সুযোগ দেয়া হলেও আমরা তাদের ইচ্ছামতই চলব। খাঁচার দুয়ার কেবল তখনই খোলা হয়, যখন পাখির পোষ মানা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়। আমাদের ঈমান ও জীবন দুটোই শঙ্কামুক্ত থাকা অবস্থায় কিংবা আমাদের মধ্যে কোনরূপ কল্যাণের সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকা অবস্থায় শয়তান আমাদের ছেড়ে দেবে মনটি আশা করা যায় না। অতএব, শত্রুর কাছে করুণা লাভের প্রয়াস বাদ দিয়ে সংগ্রাম করে জোরপূর্বক নিজেদের নিরাপত্তা ও অধিকার আদায় করে নেয়াটাই মুসলিম জাতির টিকে থাকার একমাত্র পথ।

সুরা মুমতাহিনার তৃতীয় আয়াতে আল্লাহ তাআলা আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন যে, কিয়ামতের দিন তোমাদের আত্মীয়তা ও সন্তান সন্ততি কোন উপকারে আসবে না। এতে হযরত হাতেবের ওযর খণ্ডন করা হয়েছে যে, যে সন্তানদের মহব্বতে তুমি এ কাজ করেছিলে, মনে রেখো, কিয়ামতের দিন তারা তোমার কোন উপকারে আসবে না। কুফরের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার পথে মূলতঃ সংসারের মায়াই সবচেয়ে বড় বাধা। এ বাধা দুইভাবে হতে পারে; যথা- (১) পরিবার-পরিজন মুসলমান হয়েও কুফরী শক্তির হাতে জিম্মি, অথবা (২) আত্মীয়ই যদি কাফের হয়। এক্ষেত্রে প্রথম সমস্যাটি ছিল হাতেবের (রাঃ) বেলায় এবং দ্বিতীয় অবস্থা ছিল হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর। তাই পরবর্তী আয়াতসমূহে কাফেরদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। তাঁর সমস্ত জ্ঞাতিগোষ্ঠী মুশরিক ছিল। তিনি সবার সাথে শুধু সম্পর্কোচ্ছেদই নয়- শত্রুতাও ঘোষণা করেছিলেন এবং বলেছিলেন, যে পর্যন্ত তোমরা বিশ্বাস স্থাপন না করবে এবং শিরক থেকে বিরত না হবে, সেই পর্যন্ত তোমাদের ও আমাদের মধ্যে শত্রুতার প্রাচীর অন্তরায় হয়ে থাকবে। অথচ বর্তমানে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়েও নগণ্য সংখ্যক কাফেরের অত্যাচার মুখ বুঁজে সহ্য করে। আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা কেবল তখনই হারাম হবে, যখন তা ব্যক্তিগত শত্রুতা, স্বার্থচিন্তা কিংবা অহংকারবশতঃ হয়ে থাকে। কিন্তু যখন তা দ্বীনের খাতিরে হবে, ন্যায়নীতির প্রয়োজনে হবে, তখন তা কেবল জায়েযই নয়, ফরযও বটে। বদর যুদ্ধে হযরত আবু উবাইদা (রাঃ) যখন নিজ পিতাকে হত্যা করলেন, তখন আল্লাহ তাআলা আয়াত নাযিল করেন, "তুমি কখনো এমনটি দেখতে পাবে না যে, আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমানদার লোকেরা কখনো তাদের প্রতি ভালবাসা পোষণ করে যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিরুদ্ধাচরণ করেছে- যদিও তারা তাদের পিতা, পুত্র, ভাই কিংবা বংশ-পরিবারের লোক হয়। তারা সেই লোক যাদের দিলে আল্লাহ তাআলা ঈমান দৃঢ়মুল করে দিয়েছেন এবং নিজের তরফ থেকে একটা রূহ দান করে তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন। তিনি তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করবেন, যার তলদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। তারাই আল্লাহর দল। জেনে রাখ, আল্লাহর দলই সফলকাম হবে।" (সুরা মুজাদালাঃ২২) অপর এক আয়াতে বলা হয়েছে, "হে ঈমানদারগণ, তোমাদের নিকটবর্তী কাফেরদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাও এবং তারা তোমাদের মধ্যে কঠোরতা অনুভব করুক। আর জেনে রাখ, আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে আছেন।" (সুরা তওবাঃ১২৩) তফসীর মাআরেফুল কোরআনে এ আয়াতের তাফসীরে বলা হয়েছেঃ নিকটবর্তী দুই রকমের হতে পারে। (১) অবস্থানের দিক দিয়ে অর্থাৎ, যারা তোমাদের নিকটে অবস্থানকারী, প্রথমে তাদের

BLACK ICE
SOFTWARE INC.
Driver Demo

সাথে জিহাদ কর। (২) গোত্র, আত্মীয়তা, সম্পর্ক ও বন্ধুত্বের দিক দিয়ে যারা নিকটবর্তী অন্যান্যদের আগে তাদের সাথে জিহাদ চালিয়ে যাও। যেমন, কুরআনে রাসুলে করীম (সাঃ) কে আদেশ করা হয়েছে, "হে রাসুল, নিজের নিকটাত্মীয়গণকে আল্লাহর আযাবের ভয় প্রদর্শন করুন।" তাই তিনি এ আদেশ পালনে সর্বাগ্রে স্বগোত্রীয়দের সমবেত করে আল্লাহর বাণী শুনিয়ে দেন। অনুরূপ, তিনি স্থান হিসেবে প্রথমে মদীনার আশপাশের কাফের তথা বনু কুরাইযা, বনু নযীর ও খায়বরবাসীদের সাথে বোঝাপড়া করেন। তারপর দুরবর্তী লোকদের সাথে জিহাদ করেন এবং সবশেষে রোমানদের সাথে জিহাদের ডাক আসে যার ফলে তাবুক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। (তফসীর মাআরেফুল ক্বোরআন) বর্তমান বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আমাদের কর্তব্য হল, প্রথমে স্বদেশী নাস্তিক-মুরতাদ ও মুনাফিকদের চক্রান্ত থেকে ইসলাম ও দেশের মানুষকে বাঁচাতে হবে, তারপর প্রতিবেশী ভারত ও বার্মা অধিকার করতে হবে এবং সর্বশেষে আন্তর্জাতিক ইহুদী-খৃস্টান শক্তির মোকাবেলায় অবতীর্ণ হতে হবে। কারণ, ঘরের ভিতর বিষধর সাপ জীবিত রেখে জমিতে কীট-পতঙ্গ মারতে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়। তাফসীরের কিতাবে আরো বলা হয়েছে, "বাক্যের মর্মার্থ হল, কাফেরদের সাথে এমন ব্যবহার কর, যাতে তোমাদের কোন দুর্বলতা তাদের চোখে ধরা না পড়ে।" যারা কুফরের প্রতি অনুকম্পাকে দমন করতে গিয়ে নিজের ইচ্ছার উপরে আল্লাহর ইচ্ছাকে অগ্রাধিকার দানের মাধ্যমে তাকওয়া অর্জন করেছে, আল্লাহ সেই মুত্তাকীদের সাথে রয়েছেন। ইব্রাহীমী আদর্শের মুল কথাই হল, কোন মুসলমান কোন কাফেরের অধীনে থাকতে পারে না। বিশেষতঃ যখন পরিস্থিতি এমন হয় যে, কাফের অভিভাবক তার মুসলিম পোষ্যের ঈমান অথবা জীবন যেকোন একটি কেড়ে নিতে বদ্ধপরিকর হয় এবং এ ব্যাপারে চতুর্মুখী চাপ প্রয়োগ ও ষড়যন্ত্রের ধারা অব্যাহত রাখে, তখন এমতাবস্থায় মজলুম মুসলমানের পক্ষে হিযরত করাটাই অনিবার্য হয়ে পড়ে। এ প্রসঙ্গে অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে, "পিতা বললঃ হে ইবরাহীম, তুমি কি আমার উপাস্যদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ? যদি তুমি বিরত না হও, আমি অবশ্যই প্রস্তরাঘাতে তোমার প্রাণনাশ করব। তুমি চিরতরে আমার কাছ থেকে দুর হয়ে যাও। ইবরাহীম বললঃ তোমার উপর সালাম, আমি আমার রবের কাছে তোমার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করব। নিশ্চয় তিনি আমার প্রতি মেহেরবান। আমি পরিত্যাগ করেছি তোমাদেরকে এবং তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদের এবাদত কর তাদেরকে; আমি আমার রবের এবাদত করব। আশা করি, আমার রবের এবাদত করে আমি বঞ্চিত হব না। অতঃপর তিনি যখন তাদেরকে এবং তারা আল্লাহ ব্যতীত যাদের এবাদত করত, তাদের সবাইকে পরিত্যাগ করলেন, তখন আমি তাকে দান করলাম ইসহাক ও ইয়াকুব এবং প্রত্যেককে নবী করলাম। আমি তাদেরকে দান করলাম আমার অনুগ্রহ এবং তাদেরকে দিলাম সমুচ্চ খ্যাতি।" (সুরা মারইয়ামঃ৪৬-৫০) পিতার পক্ষ থেকে যখন হত্যার হুমকি আসল, ইব্রাহীম (আঃ) যখন হত্যা প্রচেষ্টার শিকার হলেন, নির্যাতন ও চাপ যখন সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেল, যখন তাঁর উপর বহিষ্কারের আদেশ ও ত্যাজ্য করার ঘোষণা জারি হলো, তখন আর তাঁর পক্ষে সহাবস্থান করার উপায় রইল না। গোত্রের লোকেরা যখন তাঁকে পরিত্যাগ করল, তখন তিনি নিজেই তাদেরকে পরিত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর ঘটনা থেকে আমরা শিক্ষা পাই যে, আল্লাহর ওয়াস্তে কোন কিছু বর্জন করলে তার চেয়ে বহুগুণ উৎকৃষ্ট বস্তু পাওয়া যায়। আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেন, "হে ঈমানদারগণ! তোমরা স্বীয় পিতা ও ভাইদের অভিভাবকরূপে গ্রহণ করো না, যদি তারা ঈমান অপেক্ষা কুফরকে ভালবাসে। আর তোমাদের যারা তাদের অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে তারাই যালেম।" (সুরা তওবাঃ২৩) আত্মস্বীকৃত কাফেররা আল্লাহর মসজিদ যেমন আবাদ করার যোগ্যতা রাখে না, তেমনি আল্লাহর বান্দাদের দেখাশুনা করার অধিকারও তাদের নেই। আল্লাহর কোন মসজিদ যেমন কাফেরদের দখলে থাকতে দেয়া যায় না, তেমনি আল্লাহর কোন ঈমানদার বান্দাকেও কোন কাফেরের কব্জায় থাকতে দেয়া সঙ্গত নয়। মসজিদের পবিত্রতা কিংবা মানুষের দ্বীনের পবিত্রতা কোনটাই বিধর্মীদের কাছে নিরাপদ নয়। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ইসলাম গ্রহণকারী ব্যক্তির যেমন মুশরিক পিতা-মাতার অভিভাবকত্ব থেকে বেরিয়ে আসা উচিত, তেমনি মুসলিম জনগণেরও উচিত এ ব্যাপারে তাকে উৎসাহ, সহযোগিতা ও আশ্রয় প্রদানের ব্যবস্থা করা। একটি স্বাধীন মুসলিম দেশে ইসলাম গ্রহণের প্রতিদানে যদি আশ্রয় নিতে হয় ভবঘুরে কেন্দ্রে, তবে তা খুবই অনভিপ্রেত। যদিও এক্ষেত্রে নও মুসলিম যুবককে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেয়া নিরাপদ নয়, তাতে মুশরিক পিতামাতার পক্ষের লোকজনের পক্ষ থেকে অপহরণের আশঙ্কা রয়েছে, কিন্তু তাই বলে কোন এতিমখানা বা আবাসিক মাদ্রাসাতেও কি তার স্থান হতে পারে না? রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, "কোন অমুসলিমকে সঙ্গী করো না এবং তোমার ধন-সম্পদ যেন পরহেযগার ব্যক্তিই খায়।" সুরা মুমতাহিনার আলোচ্য আয়াতে এরপর মুশরিক পিতার জন্য মাগফেরাত কামনাকে ইব্রাহীমী আদর্শের অনুসরণ থেকে ব্যতিক্রম প্রকাশ করে বলা হয়েছে, অন্যসব বিষয়ে ইব্রাহীমী আদর্শের অনুসরণ তো জরুরী, কিন্তু তাঁর এ কাজটির অনুসরণ মুসলমানদের জন্য জায়েয নয়। আল্লাহ পাকের ঘোষণা, "নবী ও মুমিনের উচিত নয় মুশরিকদের মাগফেরাত কামনা করে, যদিও তারা আত্মীয় হোক- একথা সুস্পষ্ট হওয়ার পর যে তারা দোযখী। আর ইব্রাহীম কর্তৃক স্বীয় পিতার মাগফেরাত কামনা ছিল কেবল সেই ওয়াদার কারণে, যা তিনি তার সাথে করেছিলেন। অতঃপর যখন তাঁর কাছে একথা প্রকাশ পেল যে, সে আল্লাহর শত্রু, তখন তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে নিলেন। নিঃসন্দেহে ইব্রাহীম ছিলেন বড় কোমলহৃদয়, সহনশীল।" (সুরা তওবাঃ১১৩-১১৪) সুরা মুমতাহিনার আলোচ্য আয়াতের শেষাংশে ইব্রাহীম (আঃ)-এর তাওয়াক্কুলের কথা বলা হয়েছে। এই তাওয়াক্কুলের বরকতেই দয়াময় আল্লাহ স্বীয় কুদরতে নমরূদের আগুনকে ইব্রাহীম (আঃ)-এর জন্য শীতল ও শান্তিদায়ক করে দিয়েছিলেন। অতএব, সেই আল্লাহ যে পারমাণবিক বোমাকেও নিষ্ক্রিয় করে দিতে সক্ষম, এই বিশ্বাস আমাদের থাকতে হবে। এরপর ৫ম আয়াতে ইব্রাহীম (আঃ)-এর মোনাজাতের আরো একটি গুরুত্বপুর্ণ উক্তি উল্লেখ করা হয়েছে যে, তুমি আমাদেরকে কাফেরদের ফেতনার সম্মুখীন করো না। অর্থাৎ, কাফেরদের সংসর্গ, প্ররোচনা বা চাপের মুখে আমরা যেন কুফর ও শয়তানী কর্মে জড়িয়ে না পড়ি। পরিশেষে ৬ষ্ঠ আয়াতে আমাদের জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, আমরা যদি আল্লাহ ও আখেরাত পেতে চাই, তাহলে আমাদের ইব্রাহীমী আদর্শ অনুযায়ী কুফরের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করতে হবে। আল্লাহর ভালবাসা অর্জন করতে হলে তাগুতের ভালবাসাকে অন্তর থেকে মুছে ফেলতে হবে। কুফরী শক্তির সাথে সম্পর্ক রাখতে গেলে সেটা তো ব্যর্থ হবেই, খামাখা আল্লাহর রহমতও খোয়াতে হবে- দুই কুলই হারানো হবে। কালেমায়ে তাইয়্যেবার মুল শিক্ষাই হল, আসল খোদার আনুগত্য করতে হলে প্রথমে যাবতীয় বাতিল খোদার আনুগত্যকে পরিহার করতে হবে, কোন দ্বিতীয় খোদার অস্তিত্বকে বরদাশত করা চলবে না। প্রবাদ আছে, "যার সাথে মহব্বত যার, তার সাথে

কিয়ামত তার।" কিয়ামতের দিন কাফেরদের অবস্থা সম্পর্কে বলা হয়েছে, "তারা আরও বলবে, হে আমাদের রব, আমরা আমাদের নেতা ও বড়দের কথা মেনেছিলাম, অতঃপর তারা আমাদের পথভ্রষ্ট করেছিল।" (সুরা আহযাবঃ৬৭) অন্যত্র এক হতভাগার পারলৌকিক আক্ষেপ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, "জালেম সেদিন আপন হস্তদ্বয় দংশন করতে করতে বলবে, হায় আফসোস! আমি যদি রাসুলের সাথে পথ অবলম্বন করতাম! হায় আমার দুর্ভাগ্য, আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম!" (সুরা আল-ফুরকানঃ২৭,২৮) অতএব, আমাদের সতর্ক হতে হবে যে, আমাদের হাশর যেন খোদাদ্রোহী কারো সাথে না হয়। আমাদের দুই নৌকায় পা রাখার কোন সুযোগ নেই। আল্লাহ তাআলার কঠোর সতর্কবাণী, "তোমরা কি মনে কর যে, তোমাদের ছেড়ে দেয়া হবে এমনি, যতক্ষণ না আল্লাহ জেনে নেবেন তোমাদের কে যুদ্ধ করেছে এবং কে আল্লাহ, তাঁর রাসুল ও মুসলমানদের ছাড়া অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করা থেকে বিরত রয়েছে। আর তোমরা যা কর, সে বিষয়ে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত।" (সুরা তওবাঃ১৬) এখন আমরা যদি আল্লাহর আহবান থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে তাগুতের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখি, তাতে আল্লাহর কোন ক্ষতি হবে না। কারণ, আল্লাহ আমাদের প্রশংসার মুখাপেক্ষী নন, বরং তিনি নিজেই প্রশংসার মালিক। আমাদের মানা না মানার কোন পরোয়া তিনি করবেন না।

যারা কুফরী শক্তির বিজয়ের সম্ভাবনার অযুহাতে তাদের সাথে সখ্যতা রাখত, তাদের ওজর-আপত্তির জবাবে সুরা মায়েদায় এরপর বলা হয়েছে, "অতএব, সেদিন দুরে নয়, যেদিন আল্লাহতাআলা বিজয় প্রকাশ করবেন অথবা নিজের পক্ষ থেকে কোন নির্দেশ দেবেন- ফলে তারা স্বীয় গোপন মনোভাবের জন্য অনুতপ্ত হবে।" অর্থাৎ, এরা তো কল্পনাবিলাসে মত্ত যে, মুশরিক ও ইহুদীরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করবে; কিন্তু আল্লাহ তাআলার সিদ্ধান্ত এরূপ হবে না, বরং মক্কা বিজয় অতি সন্নিকটে অথবা মক্কা বিজয়ের পুর্বেই আল্লাহ তাআলা মুনাফিকদের মুখোশ উন্মোচন করে তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন। তখন তারা মনের লুক্কায়িত চিন্তাধারার জন্য অনুতপ্ত হবে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে আমরা অনুমান করতে পারি যে, অদুর ভবিষ্যতে আল্লাহ তাআলা মুসলমানদেরকে হিন্দুস্তানের মুশরিকদের উপর বিজয় দান করবেন। আজ যারা প্রতিবেশী বৃহৎ রাষ্ট্রের উপর ভরসা করে বাংলাদেশে ইসলামী মৌলবাদ নির্মুলের স্বপ্ন দেখে, তখন তারা চুড়ান্তভাবে হতাশ হবে। ভারতপ্রেমীরা প্রচার করে যে, এত বড় সামরিক শক্তিসম্পন্ন দেশের আধিপত্য অমান্য করলে দেশ ও জাতি ক্ষতির সম্মুখীন হবে। কিন্তু আলেমুল গায়েবের ওয়াদার ভিত্তিতে আমরা বিশ্বাস করতে পারি, জালেমের বিরুদ্ধাচরণ করতে গিয়ে সামান্য ত্যাগ স্বীকারের প্রয়োজন হলেও আমাদের এ কষ্ট হবে সাময়িক। চুড়ান্ত বিজয় ইনশাআল্লাহ আমাদের জন্যই অপেক্ষা করছে। "যৎসামান্য কষ্ট দেয়া ছাড়া তারা তোমাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। আর যদি তারা তোমাদের সাথে লড়াই করে, তাহলে তারা পশ্চাদপসরণ করবে। অতঃপর তাদের সাহায্য করা হবে না।" (সুরা আল-ইমরানঃ১১১) অতএব, তর্জন-গর্জনে ভীত হয়ে জালেমের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়ার চেয়ে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়াটাই হবে লাভজনক। দয়াময় আল্লাহ বলেন, "যুদ্ধ কর ওদের সাথে, আল্লাহ তোমাদের হাতে তাদের শাস্তি দেবেন। তাদের লাঞ্ছিত করবেন, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের জয়ী করবেন এবং মুসলমানদের অন্তরসমূহ শান্ত করবেন। এবং তাদের মনের ক্ষোভ দুর করবেন। আর আল্লাহ যার প্রতি ইচ্ছা ক্ষমাশীল হবেন, আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।" (সুরা তওবাঃ১৪,১৫) আমরা দেখেছি, মক্কা বিজয়ের মধ্য দিয়ে আল্লাহ তাআলার ওয়াদা বাস্তবে রূপ নেয়। পরবর্তীকলেও দেখা গেছে, যখনই মুসলমানরা আল্লাহর পথে শত্রুর বিরুদ্ধে সর্বাত্মকভাবে লড়াই করেছে, তখনই আল্লাহ তাদেরকে সাফল্য দান করেছেন এবং তাদের হাতে প্রতিপক্ষকে নাস্তানাবুদ করেছেন। নিকট অতীতে বসনিয়া যুদ্ধের সময় জাতিসংঘ তথা পশ্চিমা শক্তি বসনীয় মুসলমানদের বোঝাতে চেষ্টা করেছিল সামরিক সমাধান সম্ভব নয়। তারা সার্বদের বিজয়কে বাস্তবতা হিসেবে মেনে নিয়ে মুসলমানদের পরাজয় স্বীকারের আহবান জানাত। এদিকে ঘরের শত্রু জেনারেল আবদিক ও ডেরিকরা অংক কষে বের করেছিল যে, মুসলমানদের সীমিত শক্তি দিয়ে বানজালুকা পর্যন্ত পৌঁছানো যাবে না। তাই তারা পাঁচ হাজার সৈন্য নিয়ে মুসলিম বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সার্বদের সাথে যোগ দেয়। বহিঃশত্রু সার্ব ও গৃহশত্রু মুনাফিকদের সর্বগ্রাসী হামলার মুখে বিহাক সেক্টরে মুসলিম বাহিনী চরমভাবে কোণঠাসা হয়ে পড়ে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা তাঁর ধৈর্য্যশীল বান্দাদের কেবল উক্ত সেক্টরেই আকস্মিক বিজয় দান করেননি, বরং সমগ্র বসনিয়ায় মিলিটারী ব্যালান্স মুসলমানদের দিকে ঝুঁকে পড়ে। মুনাফিকদের শক্তি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় এবং বানজালুকা অভিমুখে মুসলিম বাহিনীর সফল অগ্রাভিযান ওদের অংকের হিসাবকে ভুল প্রমাণিত করে। সার্বরা কোনমতে মুরুব্বী ধরে শেষরক্ষা করে। "তারা কি দেখে না যে, আমি তাদের দেশকে চতুর্দিক থেকে হ্রাস করে আনছি। এরপরও তারা বিজয়ী হবে?" (সুরা আম্বিয়া) ভবিষ্যতে সার্বদের হঠকারিতায় যুদ্ধবিরতি ভেঙ্গে পড়লে শুধু বানজালুকা কেন, বেলগ্রেড পর্যন্ত মুসলিম বাহিনীর পদানত হবে ইনশাআল্লাহ। "কাফেররা অবশ্যই তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে আল্লাহর পথ থেকে নিবৃত্ত করার জন্য। তারা ধন-সম্পদ ব্যয় করতে থাকবে অতঃপর তা তাদের জন্য পরিতাপের কারণ হবে; অতঃপর তারা পরাজিত হবে। আর যারা কুফরী করে তাদেরকে জাহান্নামে সমবেত করা হবে। কারণ, আল্লাহ খবীসকে তইয়্যিব থেকে পৃথক করবেন।" (আনফাল) কখনো নির্যাতন ও ভয়ভীতির দ্বারা, আবার কখনো বা আদর-যত্ন দিয়ে বশ করে রেখে কিংবা সম্পদের প্রলোভন দেখিয়ে মুসলমানদের আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে রাখার যত চেষ্টা-তদবিরই হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত কুফরী শক্তির সকল পরিশ্রমই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে, মুসলিম শক্তি ঈমান নিয়েই মাথা তুলে দাঁড়াবে। দুশমনের ক্ষেপণাস্ত্র ও পরমাণু কর্মসুচীর সফলতা দেখে ঘাবড়ানোর কিছু নেই। তারা মুলতঃ আমাদের জন্যই ওসব বানাচ্ছে। ওদের অর্থ ও কষ্টার্জিত সমরাস্ত্র ভাণ্ডার ভবিষ্যতে ইসলামের কল্যাণেই ব্যবহৃত হবে ইনশাআল্লাহ। অন্যত্র এরশাদ হয়েছে, "যাদেরকে লোকেরা বলেছে যে, তোমাদের সাথে মোকাবেলা করার জন্য লোকেরা সমাবেশ করেছে বহু সাজ-সরঞ্জাম, তাদের ভয় কর- তখন তাদের ঈমান আরো দৃঢ়তর হয়ে যায় এবং তারা বলে, আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট; কতই না চমৎকার কামিয়াবীদানকারী।" (আল-ইমরানঃ১৭৩) ইহুদীদের সমরসজ্জার অসারতা সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, "তারা সংঘবদ্ধভাবেও তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারবে না। তারা যুদ্ধ করবে কেবল সুরক্ষিত জনপদে অথবা দুর্গ প্রাচীরের আড়াল থেকে।" (সুরা হাশর) শুধু ভারত-ইসরাইলের মত আঞ্চলিক পরাশক্তি কেন, খ্রীস্টান ও নাস্তিক্যবাদী আন্তর্জাতিক পরাশক্তিগুলোও আল্লাহর সাথে টেক্কা মেরে টিকে থাকার ক্ষমতা রাখে না। মুসলমানদের সাফল্য ও কাফেরদের বিপর্যয়ের ধারা অব্যাহত

রাখার অঙ্গীকারে দয়াময় আল্লাহ বলেন, "কাফেররা তাদের কৃতকর্মের কারণে সব সময় আঘাত পেতে থাকবে অথবা তাদের গৃহের নিকটবর্তী স্থানে আঘাত থেমে থাকবে, যে পর্যন্ত আল্লাহর ওয়াদা না আসে।" (সুরা রা'দ) "এখন আমি তাদেরকে আমার নিদর্শনাবলী দেখাব সীমান্তের প্রদেশগুলোতে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে; ফলে তাদের কাছে ফুটে উঠবে যে, এ কোরআন সত্য। আপনার রব সর্ববিষয়ে সাক্ষ্যদাতা, এটা কি যথেষ্ট নয়?" (সুরা হামীম সেজদাহঃ৫৩) আল্লাহ পাকের সুস্পষ্ট ঘোষণা, "আপনি কাফেরদেরকে বলুন, যদি তারা বিরত হয় তবে অতীতে যা হয়েছে তা ক্ষমা করা হবে; আর যদি তারা পুনর্বার লিপ্ত হয় তবে পূর্ববর্তীদেরই পন্থা নির্ধারিত আছে।" (সুরা আনফালঃ৩৮) যারা এদেশের মাটিতে ভারতীয়, মার্কিন ও বর্মী সৈন্যদের ডেকে এনে তাদের সাথে মিলে বাংলার মুসলমানদের উপর খুন-ধর্ষণ ও লুটতরাজ চালানোর স্বপ্ন দেখছে, তাদের এ দুরাশা সুদুরপরাহত। আল্লাহর সৈনিকেরা যেকোন ধরনের শয়তানী খায়েশকে শক্ত হাতে প্রতিহত করবে। "তাদের পূর্বে কত মানবগোষ্ঠীকে আমি বিনাশ করেছি, তারা তাদের চাইতে সম্পদে ও জাঁক-জমকে শ্রেষ্ঠ ছিল।" (সুরা মারইয়ামঃ৭৪) অন্যত্র বলা হয়েছে, "যেমন করে তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা তোমাদের চেয়ে বেশী ছিল শক্তিতে এবং ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির অধিকারীও ছিল বেশী।" (সুরা তওবা) অর্থাৎ, যেসব বড় বড় জাতি অতীতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে, তারা সবাই মক্কার কাফেরদের চেয়ে বহুগুণ শক্তিশালী ছিল। বর্তমান প্রেক্ষিতেও বলা যায়, যারা আফগানিস্তান থেকে নাস্তিক্যবাদী পরাশক্তিকে বিতাড়িত করেছে এবং তাদের স্থানীয় এজেন্টদেরও নির্মুল করেছে, তারা বাংলাদেশে ভারতীয় ও বর্মী আগ্রাসন প্রতিরোধ এবং পঞ্চম বাহিনীকে উচিত শিক্ষা দিতে পারবে না এমনটি ভাবার কোন কারণ নেই। ভারত-বার্মা কেউই সোভিয়েত রাশিয়ার মত শক্তিশালী নয়, আর আওয়ামী ক্যাডাররাও দোস্তমের মিলিশিয়াদের মত দুর্ধর্ষ নয়। আর আমেরিকা তো সোমালিয়ায় মাত্র তিনশত মুজাহিদের হাতে মার খেয়ে পিঠটান দিয়েছে। সুতরাং কারা অভিভাবকহীন এবং কাদের পায়ের তলার মাটি ক্রমশঃ সরে যাচ্ছে তা আজ পরিষ্কার। এরপরও যদি তারা হঠকারিতাবশতঃ আল্লাহর দ্বীনের সামনে আত্মসমর্পণ না করে, তবে তাদের পরিণতির জন্য নিজেরাই দায়ী থাকবে। ইহুদী-খ্রীস্টান, কমুনিষ্ট ও পৌত্তলিকরা হয়ত ধরে নিয়েছে যে, যুগ যুগ ধরে মুসলমানদের উপর বর্বরতা চালিয়েও যখন তারা বহাল তবিয়তে থাকতে পেরেছে, তখন বুঝি চিরদিনই যাচেছতাই করে যেতে পারবে। কিন্তু আলেমুল গায়েবের হিসাব সম্পূর্ণ ভিন্ন। আল্লাহ তাআলার সুস্পষ্ট ঘোষণা, "কাফেররা যেন মনে না করে যে, আমি যে অবকাশ দান করি, তা তাদের পক্ষে কল্যাণকর। আমি তো তাদেরকে অবকাশ দেই যাতে করে তারা পাপে উন্নতি লাভ করতে পারে। বস্তুতঃ তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাজনক শাস্তি।" (সুরা আল-ইমরানঃ১৭৮) অতএব, আল্লাহ কেবল কৌশলগত কারণেই দুশমনকে সাময়িক ছাড় প্রদান করেন। এ সম্পর্কে অন্যত্র বলা হয়েছে, "আল্লাহই তাদের সাথে উপহাস করেন। আর তাদেরকে তিনি ছেড়ে দিয়েছেন যেন তারা নিজেদের অহঙ্কার ও কুমতলবে হয়রান ও পেরেশান থাকে।" (সুরা বাকারাঃ১৫) "এবং তারা চক্রান্ত করেছে আর আল্লাহও কৌশল অবলম্বন করেছেন। বস্তুতঃ আল্লাহই হচেছন সর্বোত্তম কুশলী।" (আল-ইমরানঃ৫৪) "তারা কায়দা করে, আর আমিও কায়দা করি। অতএব, কাফেরদেরকে অবকাশ দিন, তাদেরকে অবকাশ দিন- কিছু দিনের জন্য।" (সুরা তারেকঃ১৫-১৭) কাফেরদের জয়জয়কার অবস্থা যেমন ক্ষণস্থায়ী, তেমনি মুসলমানদের শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থাও চিরস্থায়ী হবার নয়। এ সম্পর্কে এরশাদ হচেছ, "নাপাককে পাক থেকে পৃথক করে দেয়া পর্যন্ত আল্লাহ এমন নন যে, ঈমানদারগণকে সে অবস্থাতেই রাখবেন যাতে তোমরা রয়েছ।" (আল-ইমরান) অতএব, বেঈমানদের পতন ও ঈমানদারদের মুক্তি সময়ের ব্যাপার মাত্র। এ ব্যাপারে সাময়িক বিলম্বের পিছনে রয়েছে আল্লাহ তাআলার বিশেষ হেকমত। অর্থাৎ, ভাল-মন্দ উভয় পক্ষকে আলাদা করার পরই মন্দকে ধ্বংস করা হবে। উল্লেখ্য, মক্কার কাফেরদের ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তির জবাবে কুরআনে আয়াত নাযিল হয়েছিল, "আর যখন তারা বলবে, হে আল্লাহ! যদি এটাই সত্য হয়ে থাকে আপনার পক্ষ হতে, তবে আমাদের উপর আকাশ হতে প্রস্তরবৃষ্টি বর্ষণ করুন; অথবা আমাদের উপর বেদনাদায়ক আযাব নাযিল করুন। আল্লাহ এমন নন যে, আপনি তাদের মধ্যে থাকা অবস্থায় তিনি তাদেরকে শাস্তিদান করবেন; আর আল্লাহ এমনও নন যে, তিনি তাদেরকে শাস্তি দেবেন এমতাবস্থায় যে, তারা ক্ষমা প্রার্থনা করে।" (সুরা আনফালঃ৩২,৩৩) অর্থাৎ, মক্কায় অনেক নিরীহ মুসলমান ছিল যারা নির্যাতিত হওয়া সত্ত্বেও জালেমদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করত। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) ও তাঁর সিংহভাগ অনুসারীদের মক্কা থেকে বের করে আনার পরই আল্লাহ তাআলা মক্কার কাফেরদের উপর আযাবের সুত্রপাত ঘটান। এ আযাবের উদ্বোধন ঘটে বদরের ঘটনার মধ্য দিয়ে এবং এর চুড়ান্ত রূপ দেয়া হয় মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে। মক্কা বিজয়ের ঘটনাও আল্লাহ পাক সাময়িকভাবে স্থগিত করেছিলেন মক্কায় থেকে যাওয়া নিরীহ মুসলমানদের কারণে। এ সম্পর্কে সুরা ফাতহে বলা হয়েছে, "যদি মক্কায় তোমাদের অজানা কিছুসংখ্যক মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী না থাকত, যাদের পিষ্ট হয়ে যাওয়ার মাধ্যমে তোমাদের ভুক্তভোগী হয়ে পড়ার আশঙ্কা ছিল, তবে সব কিছু চুকিয়ে দেয়া হতো। কিন্তু তা এ কারণে করা হয়নি যাতে আল্লাহ যাকে ইচছা স্বীয় রহমতে দাখিল করে নেন। যদি তারা সরে যেত, তবে আমি অবশ্যই সেখানকার কাফেরদেরকে যন্ত্রণাদায়ক আযাব দিতাম।" অতএব, মক্কাবাসী মুসলমানদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পরেই আল্লাহ তাআলা মক্কার পৌত্তলিকদের উপর মুসলমানদের নির্ধারিত বিজয় দান করেন। পৃথিবীর যেকোন স্থানেই অত্যাচারী কাফেরদেরকে পাকড়াও করা হয় তাদের কবল থেকে মুসলিম জিম্মিদের মুক্ত করার পর। "প্রত্যেক খবরের একটি সময় নির্দিষ্ট রয়েছে এবং অচিরেই তোমরা তা জেনে নেবে।" (আনআমঃ৬৭) আল্লাহ তাআলা কেবল মদীনা ও খায়বরের ইহুদী এবং মক্কার মুশরিকদের পরাজিত করিয়েই ক্ষান্ত হননি, খ্রীস্টান পরাশক্তি রোম ও অগ্নিপুজক পারস্য সাম্রাজ্যদ্বয়কেও মুসলমানদের পদানত করে দিয়েছেন। বর্তমানেও পৌত্তলিক ভারত, ইহুদী ইসরাইল, খ্রীস্টান পরাশক্তি ইউরোপ-আমেরিকা এবং নাস্তিক্যবাদী চীন-রাশিয়া কেউই আল্লাহর ফয়সালা থেকে নিস্তার পাবে না। মুসলিম দেশগুলোতে তাদের আশীর্বাদপুষ্ট মুনাফিকরাও এতীম হয়ে পড়বে। "বলুনঃ তিনিই শক্তিমান যে, তোমাদের উপর কোন শাস্তি উপর দিক থেকে অথবা তোমাদের পদতল থেকে প্রেরণ করবেন অথবা তোমাদেরকে দলে-উপদলে বিভক্ত করে সবাইকে মুখোমুখী করে দেবেন এবং এককে অন্যের উপর আক্রমণের স্বাদ আস্বাদন করাবেন। দেখ, আমি কেমন ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নিদর্শনাবলী বর্ণনা করি- যাতে তারা বুঝে নেয়।" (আনআমঃ৬৫) সুরা মায়েদার আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ যেখানে বিজয়ের পূর্বাভাস দিয়েছেন সেখানে সাথে সাথে একথাও জানিয়ে দিয়েছেন যে, তারা স্বীয় গোপন মনোভাবের জন্য অনুতপ্ত হবে। পরবর্তীতে যখন মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে এ ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবে রূপ নিল, তখন বিদায় হজ্জের দিন

আল্লাহ আমাদের জানিয়ে দিলেন, "আজ কাফেররা তোমাদের দ্বীন সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়েছে। কাজেই তোমরা তাদেরকে ভয় করো না, বরং আমাকে ভয় কর।" (সুরা মায়েদা) অর্থাৎ তারা বুঝতে পেরেছে যে, ইসলামের বিজয় এক প্রতিষ্ঠিত সত্য। আল্লাহর দ্বীনের অনুসারীদের অসহায় অবস্থায় পেয়েই তারা যখন কিছু করতে পারেনি, তখন ইসলামপন্থীরা বিজয়ী হয়ে যাওয়ার পর যে তাদেরকে আর দ্বীন থেকে বিচ্যুত করা কোনক্রমেই সম্ভব হবে না এটা কাফেররা ভালভাবেই উপলব্ধি করেছে। আর এদিকে মক্কার কাফেরদের অনুসারী মদীনার মুনাফিকরাও হতাশা ও অনুতাপে ধুকে ধুকে মরছে। অতএব এখন আর আমাদের আল্লাহর দুশমনকে ভয় করার কোন কারণ নেই, বরং আল্লাহকেই ভয় করা উচিত। বদর যুদ্ধ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা চেয়েছিলেন, "আর যে ধ্বংস হবে সে যেন নিদর্শন প্রকাশের পর ধ্বংস হয়, আর যে জীবিত থাকবে সে যেন নিদর্শন প্রকাশের পর জীবিত থাকে।" (সুরা আনফাল) সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকের সামরিক নিদর্শন প্রকাশের ধারা মুলতঃ বদর থেকেই শুরু হয় এবং এরূপ প্রত্যেকটি নিদর্শনই পতনযোগ্য লোকদের পতনকে ত্বরান্বিত করতে থাকে। সাধারণত কাফেরদের নাজেহাল করা হয় সামরিক নিদর্শনের মাধ্যমে, আর মুনাফিকদের কোণঠাসা করা হয় রাজনৈতিক নিদর্শনের দ্বারা। নিদর্শন প্রকাশের মাধ্যমে অপরাধীদের ধ্বংস করার এ খোদায়ী বিধান কেবল বদরের যুদ্ধেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, তা অব্যাহত থেকেছে অনির্দিষ্টকাল। মদীনার মুনাফিকদের নির্মুল করার কাজটিও এ প্রক্রিয়াতেই সম্পন্ন হয়। সুরা মুনাফিকুন নাযিলের মধ্য দিয়ে যখন মুনাফিকদের ব্যাপারে আল্লাহর নিদর্শন চুড়ান্তভাবে প্রকাশিত হয়, তাদের গোপন মনোভাব ও যাবতীয় কলাকৌশল জনসমক্ষে উন্মোচিত হয়ে যায়, তখন আর মুনাফিক নেতা ইবনে উবাই বেশিদিন জীবিত থাকতে পারেনি। বরং সে তার মিশন ব্যর্থ হবার দুঃখে আপনাআপনি মরে যায়। অতএব কারো ক্ষমতার দাপটে আমাদের ভীত হওয়া নিষ্প্রয়োজন। আল্লাহর নির্দেশে মুসলমানদের বিজয় যখন আসবে, তখন কাফেরদের সামরিক শক্তি ও মুনাফিকদের রাজনৈতিক কুটকৌশল সবই মাঠে মারা যাবে। মুনাফিকদের দৃষ্টিভঙ্গি, পলিসি, মনোভাব ও কার্যকলাপ তাদের জন্যই অনুতাপের কারণ হবে। বলাবাহুল্য, মুনাফিকরা তাদের গোপন মনোভাব পোষণের জন্য অনুতাপ করবে না, বরং তারা অনুতাপ করবে তাদের গোপন উদ্দেশ্য ব্যর্থ ও প্রকাশ হওয়ার কারণে। যারা ইসলামবিদ্বেষী চরমপন্থী মুনাফিক, তারা মর্মাহত হবে ইসলামের ক্ষতিসাধন করতে না পারার কারণে; আর যারা কেবল সুবিধাবাদী, তারা অনুতপ্ত হবে বিজয়ী দলের সাথে থেকে ফায়দা হাসিল করতে না পারার কারণে। নিদর্শন প্রকাশের দ্বারা অনুতপ্ত হবার পরও যদি মুনাফিকরা তাদের কার্যকলাপ অব্যাহত রাখে, তাহলে তাদের শাস্তি কেবল মানসিক অনুতাপ ও রাজনৈতিক লাঞ্ছনার মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং জীবন দিয়েই কৃতকর্মের খেসারত দিতে হবে। "মুনাফিকরা এবং যাদের অন্তরে রোগ আছে এবং মদীনায় গুজব রটনাকারীরা যদি বিরত না হয়, তবে আমি অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে আপনাকে উত্তেজিত করব। অতঃপর এই শহরে আপনার প্রতিবেশী অল্পই থাকবে। অভিশপ্ত অবস্থায় তাদেরকে যেখানেই পাওয়া যাবে, ধরা হবে এবং প্রাণে বধ করা হবে। যারা পূর্বে অতীত হয়ে গেছে তাদের ব্যাপারে এটাই ছিল আল্লাহর রীতি। আপনি আল্লাহর রীতিতে কখনো পরিবর্তন পাবেন না।" (সুরা আহযাবঃ৬০-৬২) এখানে গুজব বলতে মিথ্যা অপবাদ কিংবা অমূলক আতঙ্ক ছড়ানো দুটোই বুঝানো যায়। যারা আল্লাহ ও রাসুলের নামে কুৎসা রটনা করে, তারা সম্পূর্ণভাবে নির্মুল হয়ে যাবে। এভাবেই আল্লাহর নির্দেশ তথা ফয়সালা পুরোপুরি বাস্তবায়িত হবে।

"এবং ঈমানদাররা বলবে, আরে এরাই কি তারা, যারা আল্লাহর নামে অতি দৃঢ়তার সাথে আমাদের সামনে শপথ করত যে, আমরা তোমাদের সাথেই আছি।" বর্তমান প্রেক্ষাপটেও বলা যায় যে, মদীনার মুনাফিকদের মত এদেশের মুনাফিকদেরও একই অবস্থা হবে। জনগণ বিস্ময়ের সাথে বলবে, এরাই কি তারা, যারা আমাদের কাছ থেকে আল্লাহর নামে ভোট নিয়ে ক্ষমতায় আরোহন করত? যারা শপথ করে নিজেদেরকে দেশের স্বাধীনতা ও অখণ্ডতার পক্ষের শক্তি বলে দাবী করত। আল্লাহর নামে শ্লোগান দিয়ে, ইসলামী লেবাস পরে মুমিন-মুত্তাকী সেজে ক্ষমতায় এসে জাতির উপর ইসলামবিরোধী আদর্শ, শিরক, কুফরী, মুর্তিপুজা, অগ্নিপুজা, অশ্লীলতা ও অনাচার চাপিয়ে দেয়া চরম প্রতারণার নিদর্শন। জনগণ আরো ভাববে, তবে কি আল্লাহর দোহাই দিয়ে পাপের ভয় দেখিয়ে নিজের পক্ষে আনুপত্য আদায় করা এবং আল্লাহকে নিজের জুলুমের পৃষ্ঠপোষক সাজিয়ে মজলুমের মনকে আল্লাহর প্রতি বীতশ্রদ্ধ করা ছাড়া জালেমের আর কোন উদ্দেশ্য ছিল না? অন্যত্র এরশাদ হচ্ছে, "তোমাদের সামনে আল্লাহর কসম খায় যাতে তোমাদের রাযী করতে পারে। অবশ্য তারা যদি ঈমানদার হয়ে থাকে, তবে আল্লাহকে এবং তাঁর রাসুলকে রাযী করা অত্যন্ত জরুরী।" (সুরা তওবাঃ৬২) আল্লাহর নামের মর্যাদা তারাই রক্ষা করবে, যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে, ভালবাসে। কিন্তু যারা আল্লাহকেই বিশ্বাস করে না, কিংবা আল্লাহর সাথে শত্রুতা করে, তারা আল্লাহর নামে কসম খেয়ে সত্য কথা বলবে এমনটি সম্ভব নয়। মুনাফিকরা আমাদেরকে খুশী করার জন্য আল্লাহর নামে কসম খায়। অথচ আমরা তাদের জীবন-মরণের মালিক নই, কারো উপকার বা ক্ষতি করার সামর্থ্যও আমাদের নেই। তারা যদি কিছু লাভ করতে চায়, অথবা ক্ষতি থেকে বাচতে চায়, তাহলে আল্লাহকেই সন্তুষ্ট করা উচিত। আল কুরআনে অন্যত্র বলা হয়েছে, "যারা তোমাদের পরিণতির অপেক্ষায় ওঁৎ পেতে থাকে। অতঃপর আল্লাহর ইচ্ছায় তোমাদের যদি কোন বিজয় অর্জিত হয়, তখন বলে- আমরা কি তোমাদের সাথে ছিলাম না? পক্ষান্তরে কাফেরদের যদি কোন আংশিক বিজয় হয়, তখন বলে- আমরা কি তোমাদেরকে ঘিরে রাখিনি এবং মুসলমানদের কবল থেকে রক্ষা করিনি? সুতরাং আল্লাহ তোমাদের মধ্যে কিয়ামতের দিন মীমাংসা করবেন এবং আল্লাহ মুমিনদের উপর কাফেরদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার কোন পথ রাখবেন না।" (সুরা নিসাঃ১৪১) মুসলমানদের সফলতা গোপন রাখাটা কাফের-মুনাফিকদের সাধারণ পলিসি হলেও কোন সাফল্যের পিছনে নিজেদের অবদান দেখাতে পারলে সেটা প্রচারে কার্পণ্য করে না। মুসলমানদের জাতীয় বিজয় কিংবা ব্যক্তিগত সাফল্য যেকোন ক্ষেত্রেই মুনাফিকরা এহেন নির্লজ্জ পলিসি অবলম্বন করে। তারা সব সময়ই দেখাতে চায় যে, তারা আমাদের সাথে আছে এবং ভবিষ্যতেও বোঝাতে চাইবে যে, আমাদের সাথেই ছিল। একদিকে কাফেরদের সাথে আঁতাত করে মুসলমানদের সাফল্যকে নস্যাৎ করার ধান্ধায় থাকে, অপরদিকে মুসলমানদের কাছে সকল সফলতাকে নিজেদের অবদান বলেই দাবি করে। কেবল সামরিক বা রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই নয়; ধর্মীয়, নৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রেও এরা দ্বৈত ভুমিকা পালন করে। কখনো ইসলামের কাজে সহযোগিতা করে; আবার কখনো অনৈসলামিক কাজে বাধ্য করে, আর ইসলামের কাজে বাধাদান করে। আল্লাহর রহমতে যখন মুসলমানরা ঈমানদার ও চরিত্রবান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, তখন মুনাফিকরা বলে, এটা তাদেরই অবদান। আবার যখন

BLACK ICE
SOFTWARE INC.
Driver Demo

মুসলমানরা গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দিয়ে নৈতিক অবক্ষয়ের শিকার হয়, তখন এরা বলেঃ আমরা কি তোমাদেরকে ইসলামী মৌলবাদী হওয়া থেকে রক্ষা করিনি? যদি মৌলবাদী ভাইদের খপ্পরে পড়ে ধার্মিক হতে, তাহলে জীবনটাই ভোগ করতে পারতে না। মোটকথা, মুনাফিকরা বরাবরই নিজেদের কার্যক্রমের ইতিবাচক ব্যাখ্যা পেশ করে মানুষের কাছে প্রিয় হতে চায়। তারা একই কাজের দ্বারা একই সাথে আমাদের ক্ষতিও করতে চায়, আবার খুশীও করতে চায়। শুধু তাই নয়, এই আহাম্মকের দল কিয়ামতের দিনেও তাদের চিরাচরিত ছলছাতুরীর দ্বারা আত্মরক্ষার চেষ্টা করবে। আল্লাহ তাআলা পুলসিরতের দৃশ্য অঙ্কন করেছেন এভাবে, ''যেদিন মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারীরা মুমিনদেরকে বলবেঃ তোমরা আমাদের জন্য অপেক্ষা কর, আমরাও কিছু আলো নেব তোমাদের জ্যোতি থেকে। বলা হবেঃ তোমরা পিছনে ফিরে যাও এবং আলোর খোঁজ কর। অতঃপর উভয় দলের মাঝখানে খাড়া করা হবে একটি প্রাচীর, যার একটি দরজা হবে। তার অভ্যন্তরে থাকবে রহমত এবং বাইরে থাকবে আযাব। তারা মুমিনদেরকে ডেকে বলবেঃ আমরা কি তোমাদের সাথে ছিলাম না? তারা বলবেঃ হ্যাঁ, কিন্তু তোমরা নিজেরাই নিজেদেরকে বিপদগ্রস্ত করেছ। প্রতীক্ষা করেছ, সন্দেহ পোষণ করেছ এবং অলীক আশার পিছনে বিভ্রান্ত হয়েছ, অবশেষে আল্লাহর আদেশ পৌঁছেছে। এই সবই তোমাদেরকে আল্লাহ সম্পর্কে প্রতারিত করেছে। অতএব, আজ তোমাদের কাছ থেকে কোন মুক্তিপণ গ্রহণ করা হবে না এবং কাফেরদের কাছ থেকেও নয়। তোমাদের সবার আবাসস্থল জাহান্নাম। সেটাই তোমাদের সঙ্গী। কতই না নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল।'' (সুরা হাদীদঃ১৩-১৫) এভাবে উভয় দলকে পৃথক করা এবং মুমিনদের দ্বারা মুনাফিকদের প্রতি দাঁতভাঙ্গা জবাব প্রদানের মাধ্যমেই আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন উভয় পক্ষের মাঝে মীমাংসা করবেন। দুনিয়াতে যারা প্রতারণামুলক আচরণ করেছে, আখেরাতে তাদেরকে অনুরূপ আচরণের সম্মুখীন করাটাই ন্যায়ানুগ মীমাংসার দাবি। সর্বোপরি দয়াময় আল্লাহ মুমিনদের উপর কাফেরদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনাকে নাকচ করে দিয়েছেন। অর্থাৎ, সত্যিকার মুমিন কোন অবস্থাতেই দুশমনের কাছে পরাজয় স্বীকার করবে না, কাফেরের আধিপত্য মেনে নেবে না। ঈমানদার রাষ্ট্রনায়ক কেবল সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাআলার আদেশ অনুসারেই রাষ্ট্র পরিচালনা করবে, কোন খোদাদ্রোহী পরাশক্তির ইশারা-ইঙ্গিতে নয়। এ সম্পর্কে আল্লাহ পাকের ঘোষণা, ''যারা ঈমান আনে এবং নিজেদের রবের প্রতি আস্থা রাখে, তাদের উপর শয়তানের কোন আধিপত্য নেই।'' (সুরা নহলঃ৯৯) সুরা নিসা থেকে উদ্ধৃত আয়াতটিতে কিয়ামতের দিন মীমাংসার কথা বলা হলেও আমাদের চলমান আলোচ্য সুরা মায়েদার আয়াতে দুনিয়াতেই মুমিন ও মুনাফিকদের মধ্যে একটা ফয়সালা ঘটিয়ে দেয়ার পূর্বাভাস রয়েছে। সত্য প্রকাশের পর মুসলমানরা মুনাফিকদের সমস্ত চালবাজি ধরে ফেলবে এবং কেউ আর তাদের কারো কথায় বিশ্বাস স্থাপন করবে না। আয়াতের শেষে বলা হয়েছে, ''তাদের আমলসমুহ বরবাদ হয়ে গেছে, ফলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।'' অর্থাৎ, মুসলমানরা আরো বুঝতে পারবে, মুনাফিকদের সব লোক দেখানো ধর্মীয় কার্যকলাপই বিনষ্ট হয়ে গেছে।

আলোচ্য সুরা মায়েদার পরবর্তী আয়াত থেকে জানা যায় যে, মুসলমানদের স্বার্থেই তাদেরকে অমুসলিমদের সাথে গভীর বন্ধুত্ব ও মেলামেশা করতে নিষেধ করা হয়েছে। নতুবা সত্যধর্ম ইসলামের হেফাযতের দায়িত্ব আল্লাহ নিজেই গ্রহণ করেছেন। কোন ব্যক্তি বা দলের বক্রতা ও অবাধ্যতা তো দুরের কথা, স্বয়ং মুসলমানদের কোন ব্যক্তি বা দল যদি সত্যি সত্যি ইসলাম ত্যাগ করে বসে এবং সম্পুর্ণ ধর্মত্যাগী হয়ে অমুসলিমদের সাথে হাত মেলায়, তবে এতেও ইসলামের কোন ক্ষতি হবে না। কারণ, এর হেফাযতের দায়িত্ব সর্বশক্তিমানের। তিনি তৎক্ষণাৎ অন্য কোন জাতিকে কর্মক্ষেত্রে অবতারণ করবেন, যারা ইসলামের হেফাযত ও প্রচারের কর্তব্য সম্পাদন করবে। আল্লাহ তাআলার কাজ কোন ব্যক্তি, বিরাট দল অথবা প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভরশীল নয়। (মাআরিফ) এককথায়, ইসলামের অগ্রযাত্রা আমাদের কারো জন্য ঠেকে থাকবে না। সব মুসলমান যদি বিপথগামী হয়, তাহলে আল্লাহ অমুসলিমদের মধ্য থেকে কাউকে ইসলাম গ্রহণ করাতে পারেন, অথবা নতুন মানুষ সৃষ্টি করে তাদেরকে ইসলামের পথে চালাতে পারেন। আর যদি কিছু মুসলমান লক্ষ্যচ্যুত হয় তাহলে অন্যান্য মুসলমানদের ইসলামের উপর অটল রাখবেন। কোন মুসলমান যদি যোগ্যতা লাভের পরও সে অনুযায়ী দ্বীনী দায়িত্ব পালন থেকে দুরে সরে যায়, তাহলে আল্লাহ অন্য কোন মুসলমানকে সেই যোগ্যতা দান করবেন। উল্লেখ্য, পরবর্তীতে হযরত আবুবকরের (রাঃ) নেতৃত্বে মুজাহিদরা ধর্মদ্রোহীদের বিদ্রোহকে কঠোর হস্তে দমন করেন। হযরত আবুবকর (রাঃ) ও তাঁর সহযোগীবৃন্দ যদিও পুর্ব থেকেই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, যোগ্যতা ও আন্তরিকতার সাথে দ্বীনী দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন, তাঁদের আবির্ভাব যদিও নতুন কিছু ছিল না, কিন্তু তাঁদের দ্বারা জরুরী পরিস্থিতিতে দ্বীনরক্ষার মত দুর্লভ কাজটি সম্পাদনের মাধ্যমে আল্লাহ তাঁদেরকে ইসলামের ত্রাণকর্তা হিসেবে নতুন মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেন। এছাড়া ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে দেখা যায় যারা বিপথগামী হয়ে কাফেরদের সাথে একাত্ম হয় তারা নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, আল্লাহ তাঁর নতুন বান্দাদের দ্বারা ইসলামের নুরকে প্রজ্জ্বলিত রেখেছেন। স্পেনের মুসলমানরা যখন খৃস্টানদের সাথে বন্ধুত্ব করে অধঃপতনের শিকার হল এবং শেষ পর্যন্ত ঐ বেঈমানদের আশ্বাসে বিশ্বাস স্থাপন করে আগুনে পুড়ে ও পানিতে ডুবে মারা গেল, তখন আল্লাহ তাআলা ইন্দোনেশিয়ার মাটিকে ইসলামের জন্য মনোনীত করলেন। আফগানিস্তানে যখন মুসলিম সংগঠনগুলো একে অপরের বিরুদ্ধে মোকাবেলা করতে গিয়ে দেশ-বিদেশের ইসলামবিরোধী শক্তির সাথে হাত মেলাতে শুরু করল, তখন আল্লাহ সেখানে তৃতীয় এক ইসলামী শক্তিকে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করেন। নব উত্থিত মুজাহিদরা দেখিয়ে দেয়, মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত নয়, বরং মসজিদ থেকেই মোল্লার দৌড় শুরু। যদিও সেই মুজাহিদরা এখন ক্ষমতায় নেই, নিজেদের কিছু ভ্রান্তি বা বাড়াবাড়ির কারণে হোক, বা অসম পরাশক্তির মোকাবেলায় কৌশলগত পশ্চাদপসরণের মাধ্যমে হোক, তাদেরকে বিপর্যয়ের শিকার হয়ে ক্ষমতা থেকে সরে পড়তে হয়েছে; কিন্তু তারা যখন ভ্রান্তি ও দুর্বলতা কাটিয়ে উঠে ধৈর্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারবে, তখন আল্লাহ আবার তাদেরকে জয়যুক্ত করবেন। সুরা মায়েদার আলোচ্য আয়াতে যেখানে একথা বলা হয়েছে যে, মুসলমানরা ধর্মত্যাগী হয়ে গেলে আল্লাহ তাআলা কোন নতুন জাতির অভ্যুত্থান ঘটাবেন, সেখানে সেই পুণ্যাত্মা জাতির কিছু গুণাবলীও বর্ণনা করেছেন। তাদের প্রথম গুণের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসবেন এবং তারা আল্লাহকে ভালবাসবে। বস্তুতঃ মহান রব সৃষ্টির পর সবাইকেই ভালবাসেন; অতঃপর যারা ভালবাসার প্রতিদান ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মাধ্যমে দেয়, তাদের প্রতি দয়াময়ে ভালবাসা সীমাহীন বৃদ্ধি পায়; আর যারা ভালবাসার প্রতিদান কুফরী, শত্রুতা ও নিমকহারামির মাধ্যমে দেয়, তারা ভালবাসা তথা রহমত হারিয়ে লানতপ্রাপ্ত হয়। আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের দ্বিতীয় গুণ সম্পর্কে বলা হয়েছে, তারা মুমিনদের প্রতি বিনয়-নম্র হবে এবং কাফেরদের প্রতি কঠোর হবে। অর্থাৎ, তারা হবে এমন এক জাতি, যাদের ভালবাসা ও শত্রুতা নিজ সত্ত্বা ও সত্ত্বাগত অধিকারের পরিবর্তে শুধু আল্লাহ, তাঁর রাসুল ও ধর্মের খাতিরে নিবেদিত হবে। এ কারণেই তাদের বন্ধুকের নল আল্লাহ ও রাসুলের অনুপতদের দিকে নয়; বরং তাঁর শত্রু ও অবাধ্যদের দিকে নিবদ্ধ থাকবে। তারা সবাই পরস্পরের প্রতি বিশ্বস্ত ও আস্থাশীল থাকবে, তাদের যাবতীয় অনাস্থা ও অবিশ্বাস কেবল কাফেরদের প্রতিই প্রযোজ্য হবে।

BLACK ICE
SOFTWARE INC.
Driver Demo

কোন পার্থিব ধন-সম্পদের লোভ কিংবা দলগত ভিন্নতা তাদের ভ্রাতৃত্বের সম্পর্কে চিড় ধরাতে পারবে না। কারণ, ইসলামের সৈনিকদের লক্ষ্য হবে ইসলামী বিপ্লব। ইসলামী ঐক্যের খাতিরে তারা পরস্পরের ভুল-ত্রুটিকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবে। কেবলমাত্র ভিন্ন নেতৃত্বের প্রতি আস্থা পোষণের অপরাধে কোন দ্বীনী ভাইকে দুর দুর করবে না। দয়াময় আল্লাহ তাঁর নবীকে বলেন, "আল্লাহর রহমতেই আপনি তাদের জন্য কোমল হৃদয় হয়েছেন। পক্ষান্তরে আপনি যদি রূঢ় ও কঠিন হৃদয় হতেন, তাহলে তারা আপনার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ত।" (সুরা আল-ইমরান) যারা আল্লাহর নবীর উত্তরসুরী তথা নায়েবে রাসুলের ভুমিকা পালন করবেন, তাঁদের চরিত্রেও নবীর এই গুণটির প্রতিফলন থাকবে। একজন মুসলমান সর্বদাই কাফেরের প্রতি হবে বজ্রের ন্যায় কঠোর, আর নিরপরাধ মুমিনের প্রতি হবে কুসুমের ন্যায় কোমল। এমনকি যদি কখনো দেখা যায় যে, ঈমানদার ভাইয়ের কাছে প্রয়োজনীয় জিনিস চেয়েও পাওয়া না যায় এবং বেঈমান দুশমনের কাছে না চাইতেই পাওয়া যায়, তবুও নীতি পরিবর্তন করবে না; বরং নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে আসল রহস্য যাচাই করে নেবে। কাফের তো চায় মুসলমান ভাইদের পরস্পর থেকে দুরে সরিয়ে নিজে প্রত্যেকের কাছে সাহায্যকারী ও ত্রাণকর্তা হিসেবে আবির্ভুত হতে। সচেতন মুসলমান ভুলেও কোনদিন কাফেরের বাসনা পুরণ করবে না। দ্বীনী ভাইদের প্রতি বিনয় ও নম্রতাই মুমিন হওয়ার অন্যতম মাপকাঠি। হাদীসে আছে, "দুইটি গুণ কোন মুনাফিকের ভিতর একত্রে পাওয়া যাবে না- সদ্ব্যবহার এবং ধর্মজ্ঞান।" (তিরমিযী) অর্থাৎ, যখন সে সদ্ব্যবহার করবে তখন নিজেকে ধার্মিক হিসেবে দেখাবে না বরং ধর্মহীন হিসেবেই পেশ করবে; যাতে মানুষ মনে করে ধর্মহীনরাই উদার হয়। আবার যখন সে নিজেকে ধার্মিক হিসেবে জাহির করবে তখন ভুলেও কারো সাথে ভাল ব্যবহার করবে না; বরং নিষ্ঠুরতা প্রদর্শনের মাধ্যমে দেখাতে চাইবে যে, ধর্মই মানুষকে নির্মমতা শেখায়। তবে মুনাফিকের নম্র ব্যবহার ও অনুগ্রহ মুমিনদের কোনরূপ প্রীত ও প্রভাবিত করবে না এবং নিষ্ঠুরতাও ভীত করবে না; আল্লাহর নির্দেশিত কঠোর নীতি বাস্তবায়নে নিবেদিত মুজাহিদের সংকল্পে এতটুকু চিড় ধরাতে পারবে না। কাফেরদের হাতে নির্যাতিত হয়ে মুসলমানরা আশ্রয়প্রার্থী হলে ইসলামী শাসকরা তাদের সাদরে গ্রহণ করবে। এমনকি মুহাজির ভাইদের দ্বারা যদি কিছু অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণ হয়েও থাকে, তা তারা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবে। তাদের পদক্ষেপ তাদের বিরুদ্ধেই হবে, যারা মুসলিম ভাইদের এ অবস্থা করেছে। অথচ বর্তমান মুসলিম বিশ্বের শাসকরা মুমিনদের প্রতিই কঠোর, আর কাফেরদের সামনে নতজানু। আল্লাহর নির্দেশিত মানদণ্ড থেকে বিচ্যুতির প্রেক্ষাপটে আজ এমন এক ইসলামী শক্তির উত্থান অপরিহার্য; যারা ঈমানদার মুসলমানদের প্রতি ক্ষমাসুন্দর আচরণ করবে এবং খোদাদ্রোহী কুফরী শক্তিকে কঠোর হস্তে দমন করবে। আর আমাদের আলেম সমাজ তথা ইসলামী নেতারাও যদি কেবল একে অপরকে প্রতিপক্ষ বিবেচনা করেন, ইসলামী চেতনার লোকদের প্রতি আপোষহীনতা আর ইসলামের শত্রুদের প্রতি আপোষকামিতার হাত বাড়িয়ে দিতে থাকেন, দেশের শাসকবর্গকে নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী ইসলামী নেতৃত্ব ও ইসলামী সংগঠনের বিরুদ্ধে উস্কানী প্রদান এবং ইসলামবিরোধী সংগঠনের সাথে আপোষ ও অহিংসার নীতি গ্রহণের নসিহত পেশ করার পলিসি অব্যাহত রাখেন, আর দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো ছেয়ে যাওয়া নাস্তিক্যবাদী দার্শনিকদের হাজারো ইসলামবিরোধী বই-পুস্তকের ব্যাপারে নীরব থেকে জ্ঞানীগুণী কোন ইসলামী চিন্তাবিদের দু'চারটা ধর্মীয় বই বিতাড়নকেই নিজেদের জিহাদী জজবা হিসেবে পণ্য করতে থাকেন, তাহলে আল্লাহ তাদেরকে সরিয়ে দিয়ে সত্যিকার নিষ্ঠাবান ত্যাগী জিহাদী চেতনাসম্পন্ন তরুণদেরকেই ইসলামী আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়ে সম্মানিত করবেন-- যারা ব্যক্তিগত জেদাজেদি, হিংসা, সংকীর্ণতা ও খামখেয়ালীপনার পরিবর্তে আল্লাহর দ্বীনকে অগ্রাধিকার দেবে। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) ঘোষণা করেছেন, "এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। সে তার উপর জুলুমও করবে না এবং তাকে শত্রুর হাতে সমর্পণও করবে না।" (বুখারী, মুসলিম)

মুমিনদের তৃতীয় গুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। এ দায়িত্ব পালনে ঈমানদার বান্দারা যেকোন মুল্যে এগিয়ে যাবে। কোনপ্রকার সামরিক, রাজনৈতিক, প্রাকৃতিক বা বৈষয়িক বাধা-বিপত্তি তাদের অগ্রযাত্রাকে থামিয়ে রাখতে পারবে না। আল্লাহর অনুগত বান্দাদের চতুর্থ গুণটি হলো, ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত ও সমুন্নত করার চেষ্টায় তারা কোন ভর্ৎসনাকারীর ভর্ৎসনারই পরোয়া করবে না। অর্থাৎ, তারা একদিকে যেমন জিহাদের বিনিময়ে কোন মানুষের প্রশংসা বা পুরস্কার কামনা করবে না, অপরদিকে কোন মানুষের শাস্তি বা তিরস্কার তাদেরকে জিহাদী দায়িত্ব থেকে নিবৃত্ত করতে পারবে না। পুর্বে আলোচিত হয়েছে সেই সমস্ত কাপুরুষদের কথা, যারা জীবন ও ইজ্জতের ক্ষতির আশংকায় কুফরের সাথে সংঘাত এড়িয়ে চলে। আর এখন বর্ণিত হচ্ছে সেই সমস্ত বীর পুরুষদের কথা, যারা জান ও মান-সম্মানের কোন পরোয়া না করে কুফরের মোকাবেলায় জিহাদ চালিয়ে যায়। শত্রুভাবাপন্ন কাফের হোক, আর মিত্রভাবাপন্ন মুসলমান হোক- কারো কোন আপোষ প্রস্তাব ও পিছু হটার পরামর্শকে মুজাহিদরা আমলে নেয় না। কারণ তারা জানে, "তোমরা যদি তাদের আনুগত্য কর তবে তোমরাই মুশরিক হবে।" (সুরা আনআম) মুলতঃ আল্লাহর আদেশের উপরে অন্য কারো আদেশকে অগ্রাধিকার দেয়াই শিরক। হাদীসে আছে, "সৃষ্টিকর্তার নাফরমানীর কাজে কোন সৃষ্টজীবের আনুগত্য জায়েয নয়।" এছাড়া আল্লাহর চেয়ে আল্লাহর দুশমনকে অধিক ভয় করাটাও একপ্রকার শিরকের পর্যায়ে পড়ে বিধায় এক্ষেত্রে মুসলিম জনগণের পরামর্শেও দুশমনের সামনে নতি স্বীকার করা যাবে না। একজন মুমিন মুজাহিদের কাছে বিবেচ্য বিষয় একটাই- আপন রবের সন্তুষ্টি অর্জন। লোকে কি বলল না বলল, এটা তারা হিসেবের মধ্যে আনবে না। বেশির ভাগ মানুষ কিভাবে চলে সেটাকেও তারা সত্যের মাপকাঠি বলে গ্রহণ করবে না। কারণ, "আর যদি আপনি পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের কথা মেনে নেন, তবে তারা আপনাকে আল্লাহর পথ থেকে বিপথগামী করে দেবে। তারা শুধু অলীক কল্পনার অনুসরণ করে এবং সম্পূর্ণ অনুমানভিত্তিক কথাবার্তা বলে থাকে।" (সুরা আনআমঃ১১৬) মানুষের তিরস্কারের ভয় এমনই এক সর্বনাশা বস্তু, যা আবু তালেবের মত হৃদয়বান ব্যক্তিকেও কলেমা পড়ার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত করেছে। সমাজের লোক কি বলল এটাই যদি বিচার্য বিষয় হয়, তবে জাহেলী যুগে তো কন্যা সন্তান জীবিত রাখাটাও অপরাধ বলে গণ্য হতো। কেউ এমনটি করলে সমাজের চোখে লজ্জিত ও সমালোচিত হতো। কওমে লুতের মধ্যে লুত (আঃ) ও তাঁর মুষ্টিমেয় অনুসারী ছাড়া বাকিরা যা করত, সেটা কি অনুসরণযোগ্য ছিল? "তাঁর সম্প্রদায় এছাড়া কোন উত্তর দিল না যে বের করে দাও এদেরকে শহর থেকে। এরা খুব সাধু সাজতে চায়।" (সুরা আরাফঃ৮২) জালেমদের এ তিরস্কার ও বিদ্রুপের সামনে নতি স্বীকারের কোন অবকাশ তখন ছিল কি? পাপিষ্ঠরা যখন নিজেদের বর্বরতার পক্ষে যুক্তি দেখাতে না পেরে মুসলমানদের সাধুতা নিয়ে খোঁটা দিল, তখন তারা ঘাবড়ে যাওয়ার পরিবর্তে দৃঢ়তা

BLACK ICE
SOFTWARE INC.
Driver Demo

অবলম্বন করলেন। আল্লাহর প্রতিশ্রুত মুজাহিদরাও তাদের মতই সাহসী হবে। তারা কখনো যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলার পলিসি অবলম্বন করবে না, কারণ আল্লাহ তাআলা যুগের শপথ করে মানুষের ক্ষতিগ্রস্ততার কথা উল্লেখ করেছেন। আল্লাহর হুকুম তথা ঈমানী দায়িত্ব পালনের জন্য তারা মানুষের সম্মতির অপেক্ষা করবে না। "ফেরাউন (জাদুকরদের) বলল, আমার অনুমতি দানের পুর্বেই তোমরা কি তাকে (মুসাকে) মেনে নিলে? নিশ্চয় সে তোমাদের প্রধান, যে তোমাদেরকে যাদু শিক্ষা দিয়েছে। শীঘ্রই তোমরা পরিণাম জানতে পারবে। আমি অবশ্যই তোমাদের হাত ও পা বিপরীত দিক থেকে কর্তন করব এবং তোমাদের সবাইকে শুলে চড়াব। তারা বলল, কোন ক্ষতি নেই। আমরা আমাদের রবের কাছে ফিরে যাব।" (সুরা শুয়ারাঃ৪৯,৫০) যাদুকরদের ঈমানী চেতনা ও ভালবাসার আকর্ষণকে ফেরাউন যাদুর প্রভাব বলে খাটো করে দেখার অপপ্রয়াস চালিয়েছে। বর্তমানেও মুসলমানদের মাঝে ঈমান, ঐক্য ও সংহতি দেখলে ঈর্ষান্বিত দুশমনেরা একে যাদু বলে গণ্য করে। ঈমানদারদের আল্লাহর প্রতি মহব্বত এবং নিজেদের পারস্পরিক ভালবাসা কোন যাদু নয়, বরং আল্লাহর দেয়া নেয়ামত। শয়তানই এ ভালবাসায় ফাটল ধরানোর জন্য যাদুর আশ্রয় নেয়। ফেরাউনের হুমকি ও তিরস্কার নও মুসলিমদের অন্তরে এতটুকু ভীতি সঞ্চার করতে পারেনি। তারা দেখিয়ে দিয়েছে, ঈমানদারের জন্য আল্লাহর দ্বীনের মায়া জীবনের মায়ার বহু উর্ধ্বে। আল্লাহর পথে জিহাদ করতে গেলে শত্রু-মিত্র, আপন-পর, মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকলের পক্ষ থেকেই বৈষয়িক ও মৌখিক বাধার সম্মুখীন হতে হয়। তফসীর মাআরেফুল ক্বোরআনে বলা হয়েছে, "চিন্তা করলে বুঝা যাবে, যে কোন আন্দোলন পরিচালনার পথে দুটি বিষয় অন্তরায় হয়ে থাকে। প্রথমত, বিরোধী শক্তির প্রবলতা এবং দ্বিতীয়ত, আপন লোকদের ভর্ৎসনা ও তিরস্কার। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, যারা আন্দোলন পরিচালনায় দৃঢ়সংকল্প হয়ে অগ্রসর হয়, তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিরোধী শক্তির কাছে নতি স্বীকার করে না- জেল-জুলুম, জখম, হত্যা ইত্যাদি সবকিছুই অম্লান বদনে সহ্য করে নেয়। কিন্তু আপন লোকদের ভর্ৎসনা-বিদ্রূপ ও নিন্দাবাদের মুখে বড় বড় কর্মবীরদেরও পদস্খলন ঘটে। সম্ভবতঃ একারণেই আল্লাহ তাআলা এখানে এর গুরুত্ব ফুটিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে বলেছেন যে, তারা কারো ভর্ৎসনার পরোয়া না করে জিহাদ অব্যাহত রাখবে।" আপনজনের তিরস্কারে মুজাহিদদের সংকল্প অপরিবর্তিত থাকবে, আর দুশমনের তিরস্কারে আত্মবিশ্বাস আরো জোরালো হবে। শেরে বাংলা ফজলুল হক বলেন, "ওরা যখন আমাকে অভিনন্দন জানায় তখন আমি চিন্তিত হই যে মুসলমানদের ক্ষতি করলাম কিনা। আর যখন ওরা গালি দেয় তখন আমি আপন ভুমিকার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হই।" মাওলানা মওদুদী (রহঃ) বলেন, "ইহা তাদেরকে নিশ্চিন্ত করিয়া দেয় যে, নবীর এই দাওয়াত নিঃসন্দেহে কল্যাণ ও সত্যের দাওয়াত। অন্যথায় শয়তান ইহার উপর এত ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিত না।" (তাফহীমুল কুরআনঃ৮ম খণ্ড) অতএব, আল্লাহর পথে জিহাদ করা এবং জীবনে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী চলার ক্ষেত্রে কারো কোন তিরস্কারকে বিবেচনায় আনা চলবে না। মোটকথা, ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক সকল পর্যায়ে দৃঢ়চিত্ত মুজাহিদরা কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারে নিজেদের নীতি পরিবর্তন করবে না।

সুরা মায়েদার আলোচ্য আয়াতে এ পরম সত্যটি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যে, এসব গুণ, এগুলোর যথাসময়ে প্রয়োগ, এগুলোর মাধ্যমে ইসলামী জিহাদে সাফল্য অর্জন প্রভৃতি বিষয় শুধুমাত্র চেষ্টা-তদবির, শক্তি অথবা দলের জোরে অর্জিত হয় না; বরং এ সবই আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ। আমাদের আধ্যাত্মিক শক্তি দান করা এবং এর মাধ্যমে ধর্মীয়, সামরিক ও রাজনৈতিক বিজয়ের পথ দেখানো সম্পুর্ণ আল্লাহ তাআলার ইচ্ছাধীন। আমাদের ব্যক্তিগত ঈমান-আমল থেকে শুরু করে জিহাদী দায়িত্ব পালন সবকিছুই আমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ, আল্লাহর প্রতি আমাদের অনুগ্রহ নয়। পরিশেষে বলা হয়েছে, এসব গুণাবলীর প্রাচুর্য আল্লাহই দান করেন এবং কারা এগুলো পাওয়ার উপযোগী, সে সম্পর্কে তিনিই মহাজ্ঞানী।

পুর্ববর্তী আয়াতসমুহে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে শত্রু থেকে সাবধান করেছেন। এরপর এ নিষেধাজ্ঞা লংঘনের পরিণতি সম্পর্কে জানিয়ে দিয়েছেন। অতঃপর আমাদের প্রকৃত বন্ধুর পরিচয় তুলে ধরেছেন। আমাদের ভালবাসার প্রকৃত হকদার একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলামীন। কারণ, যাবতীয় নেয়ামত দয়াময় আল্লাহরই দান। রাসুল (সাঃ) যেহেতু আল্লাহর সাথে আমাদের পরিচিত করেছেন, সম্পর্ক ও নৈকট্য স্থাপন করে দিয়েছেন, তাই একমাত্র আল্লাহর খাতিরে রাসুল আমাদের ভালবাসার অধিকারী। যারা আল্লাহ ও রাসুলের প্রতি ঈমানদার, আল্লাহর আনুগত্য ও রাসুলের (সাঃ) অনুসরণের ভিত্তিতে তারা সবাই আমাদের বন্ধু। পুর্বের আয়াতে আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দাদের রাজনৈতিক ও সামরিক বৈশিষ্ট্য তথা মুজাহিদ হিসেবে তাদের গুণাবলী উল্লেখ করেছেন। আর আলোচ্য আয়াতে মুমিনদের ধর্মীয় ও নৈতিক কর্মকাণ্ড এবং সামাজিক আচার-ব্যবহার সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। আল্লাহ ও রাসুলের পরে তারাই আমাদের বন্ধু, যারা নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে এবং বিনম্র। তারা ব্যক্তিগতভাবে নামায আদায়ের পাশাপাশি পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে নামায প্রতিষ্ঠা করে। নামায শিক্ষাদানের পাশাপাশি সর্বত্র তা পালনের অনুকুল পরিবেশ তৈরি করে, সকল কাজের উপরে নামাযকে অগ্রাধিকার দেয়, জনগণকে এতে উদ্বুদ্ধ করে এবং সর্বাবস্থায় নামাযের পৃষ্ঠপোষকতা করে। ঈমানদার শাসকেরা নামাযকেই মানব চরিত্র সংশোধনের উপায় হিসেবে গ্রহণ করবে এবং এর মাধ্যমে রাষ্ট্রের তৃণমুল পর্যায় থেকে সর্বোচ্চ পর্যায় পর্যন্ত সকল স্থান থেকে যাবতীয় পাপাচারের মুলোৎপাটন করে সর্বত্র শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত করবে। দয়াময়ের মুমিন বান্দারা নিজেরা যাকাত প্রদানের পাশাপাশি ধনীদের কাছ থেকে আদায় করে রাষ্ট্রীয়ভাবে তা দরিদ্রদের মাঝে বিতরণের ব্যবস্থা করবে। এভাবে একটি ইনসাফপুর্ণ ও আত্মনির্ভরশীল জাতি গড়ে উঠবে। নামায ও যাকাত কায়েমের মত গুরুত্বপুর্ণ দ্বীনী দায়িত্ব পালনের পরও এর দ্বারা কোন অহঙ্কার তাদের মনে প্রশ্রয় পাবে না; বরং বিনয় ও নম্রতাই হবে তাদের চরিত্রের ভুষণ। যারা আলোচ্য গুণাবলী অর্জনের দ্বারা নিজেরা পরিপুর্ণ ঈমানদার হবে এবং নিজেদের বন্ধুত্বও কেবল ঈমানদারদের সাথেই স্থাপন করবে, তাদেরকে আল্লাহ তাআলা "আল্লাহর দল" বলে আখ্যায়িত করে বিজয়ী বলে ঘোষণা দিয়েছেন। "যারা ঈমানদার তারা যে জিহাদ করে আল্লাহর রাহেই। পক্ষান্তরে যারা কাফের তারা লড়াই করে তাপুতের পক্ষে। সুতরাং তোমরা জিহাদ করতে থাক তাপুতের আউলিয়াতের বিরুদ্ধে-- (দেখবে) শয়তানের চক্রান্ত একান্তই দুর্বল।" (সুরা নিসাঃ৭৬) সর্বশক্তিমান আল্লাহর মদদপুষ্ট শক্তির মোকাবেলায় সীমিত শক্তির অধিকারী শয়তানের সাহায্য নিয়ে টিকে থাকা সম্পুর্ণ অসম্ভব। কারণ, শয়তান বেচারা নিজেই বেঁচে থাকার জন্য আল্লাহর উপর নির্ভরশীল। শয়তানের দলের মোকাবেলায় আল্লাহর দলের বিজয় এক অবধারিত সত্য। অন্যত্র বলা হয়েছে, "আর তোমরা নিরাশ হয়ো না এবং দুঃখ করো না, তোমরাই জয়ী হবে, যদি তোমরা মুমিন হও।" (সুরা আল-ইমরানঃ১৩৯)

এতক্ষণ যাদের সাথে বন্ধুত্ব হবে তাদের পরিচয় তুলে ধরার পর পুনরায় কাদের সাথে বন্ধুত্ব করা যাবে না সেই প্রসঙ্গে ফিরে আসা হয়েছে। তাদের আলামত সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, ইহুদী-খ্রীস্টান অথবা অন্যান্য কাফেরদের মধ্যে যে কেউ আমাদের দ্বীন নিয়ে খেলা-তামাশায় মত্ত হবে, তাদের কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করা চলবে না। করলে তা হবে আমাদের তাকওয়া ও ঈমানের পরিপন্থী। তাদের সম্পর্কে অন্যত্র এরশাদ হচ্ছে, "আর যদি তাদের কাছে জিজ্ঞেস কর, তবে তারা বলবে, আমরা তো কথার কথা বলছিলাম এবং কৌতুক করছিলাম। আপনি বলুন, তোমরা কি আল্লাহর সাথে, তাঁর আয়াতসমূহের সাথে এবং তাঁর রাসুলের সাথে ঠাট্টা করছিলে? ছলনা করো না, তোমরা যে কাফের হয়ে গেছ ঈমান প্রকাশের পর।" (সুরা তওবা) ইসলামের শত্রুরা আল্লাহ, নবী-রাসুল, পরকাল, বেহেশত-দোযখ প্রভৃতি নিয়ে হাসি-কৌতুক করে। আল্লাহ তাআলার হুকুম-আহকামের মধ্যে যে বিধানটি নিয়ে সবচেয়ে বেশি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ হয় তা হলো পর্দাপ্রথা। পর্দা নিয়ে কটাক্ষ করা কেবল তার পক্ষেই সম্ভব, যে নিজে নোংরামিতে অভ্যস্ত। এছাড়া জিহাদের বিধান, শাহাদাতের ফযীলত, শহীদের মর্যাদা ইত্যাদি বিষয়গুলোও তাদের হাসি-তামাশার অন্যতম খোরাক। আমরা জানি, হারামকে হালাল মনে করা কুফরী। এখন যারা হালাল-হারামের বিধানকেই তামাশার বস্তু মনে করে, এমনকি বিধানদাতা আল্লাহকে পর্যন্ত তামাশার লক্ষ্যবস্তু বানায়, আল্লাহর নির্ধারিত ফরযকে হারাম ও হারামকে ফরয বানাতে চায়, খোদাদ্রোহী কার্যকলাপের বিরোধিতাকে দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য করে, তারা যেকোন বিচারেই কাফের বলে গণ্য। ইহুদী-খ্রীস্টানরা আল্লাহর কিতাব নিয়েও তামাশায় লিপ্ত হয়। "আর তাদের মধ্যে একদল রয়েছে, যারা বিকৃত উচ্চারণে মুখ বাঁকিয়ে কিতাব পাঠ করে, যাতে তোমরা মনে কর যে, তারা কিতাব থেকেই পাঠ করছে।" (সুরা আল-ইমরান) এখানে বলা হয়েছে তারা কিভাবে সুকৌশলে কিতাবের অর্থ বিভ্রাট ঘটায়। এছাড়া তারা ব্যঙ্গ করার উদ্দেশ্যেও উচচারণ ও অর্থ বিকৃত করে থাকে। এ ধরনের বদমায়েশী কেবল নিজেরাই করে না, আমাদেরকেও এরূপ বেয়াদবিপূর্ণ আচরণ শেখাতে চায়। হাসি-তামাশা মুলত শত্রুতা প্রকাশেরই একটি সহজ ও নিরাপদ মাধ্যম। ধর্ম নিয়ে সরাসরি গালিগালাজ করা হলে কেউ তা গ্রহণ করবে না, বরং মানুষের ধর্মীয় অনুভুতিতে আঘাত লেগে উল্টো প্রতিক্রিয়া হবে; তাই মতলববাজের দল কৌতুক করার ছলে ধর্মীয় বিষয়াদিকে হালকা করার মাধ্যমে মানুষকে ধর্মের পথ থেকে সরিয়ে দিতে চায়। ইসলামের শত্রুরা আমাদের নামাযের আহবান নিয়েও উপহাস করে বেড়ায়। বর্ণিত আছে যে, মদীনায় এক খ্রীস্টান আযানে রাসুলের (সাঃ) নাম শোনার পর বলত, আল্লাহ মিথ্যাবাদীকে পুড়িয়ে ভস্মীভুত করুক। শেষ পর্যন্ত সে নিজেই অগ্নিকাণ্ডে সপরিবারে প্রাণ হারায়। আমাদের দেশের জনৈক স্বনামধন্য কবি আযানকে একটি বিশেষ শ্রেণীর ডাকের সাথে তুলনা করেছিলেন। তিনি ব্যক্তিগতভাবে উক্ত শ্রেণীর কার্যকলাপের সমর্থক হলেও আযানের অবমাননার জন্য তাদেরকেই দৃষ্টান্ত হিসেবে বেছে নিয়েছেন। আর এমন প্রকাশ্য ধর্মদ্রোহী ব্যক্তিকে যিনি সসম্মানে নিজের পাশে বসতে দেন, তিনি কোন মুসলিম দেশকে শাসন করার অধিকার রাখেন না। আবার কেউ হয়ত বলে নামাজ পড়লে সময় নষ্ট। খোদাদ্রোহী অধ্যাপকরা ছাত্রদের নামাজ তরক করানোর জন্য উদ্দেশ্যমুলকভাবে ক্লাস দীর্ঘায়িত করে। তারা যুক্তি দেখায়, নামাজের চেয়ে লেখাপড়া বড়। আচ্ছা, আপন রবের নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কাজে যদি সময় নষ্ট হয়, তাহলে সময়টা কাজে লাগবে কি করলে? "তাদেরকে যখন বলা হয়, দয়াময়কে সেজদা কর, তখন তারা বলে, দয়াময় আবার কে? তুমি কাউকে সেজদা করার আদেশ করলেই কি আমরা সেজদা করব? এতে তাদের পলায়নপরতাই বৃদ্ধি পায়।" (সুরা আল-ফুরকানঃ৬০) তারা নিজেরা যেমন নামাজের আহবানকে কটাক্ষ করে, তেমনি মানুষকেও নামাজের দাওয়াত প্রত্যাখ্যানের কায়দা-কানুন শিক্ষা দেয়। আবার কেউ কেউ আছে যাদেরকে নামাযের জন্য আহবান করা হলে দোয়া চেয়েই ভদ্রতা রক্ষা করে। এদেরকে আল্লাহ নির্বোধ বলে আখ্যায়িত করেছেন কারণ তারা নামাযের গুরুত্ব ও প্রাণশক্তি সম্পর্কে অবগত নয়। আর যারা নামাযের উপকারিতার কথা জানা সত্ত্বেও নামায নিয়ে উপহাসে মেতে ওঠে, তারাও জেনেশুনে নিজেদেরকে নিশ্চিতভাবে চির ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়ার মাধ্যমে মুলতঃ নির্বুদ্ধিতারই পরিচয় দিচ্ছে। মুনাফিকদের নির্বুদ্ধিতা সম্পর্কে অন্যত্র বলা হয়েছে, "আর যখন তাদেরকে বলা হয়, অন্যান্যরা যেভাবে ঈমান এনেছে তোমরাও সেভাবে ঈমান আন, তখন তারা বলে, আমরাও কি ঈমান আনব বোকাদেরই মত! মনে রেখো, প্রকৃতপক্ষে তারাই বোকা, কিন্তু তারা তা বোঝে না।" (সুরা বাকারাঃ১৩) তারা ঈমানের দাওয়াত ও নামাযের আহবানে সাড়া দেয়াকে বোকামি মনে করে। কারণ, নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত পালন করা তাদের মতে কষ্টদায়ক, ক্ষতিকর ও ঝুঁকিপূর্ণ। এর চেয়ে বরং নিজেদের খেয়াল-খুশীমত ভোগ-বিলাস ও আরাম-আয়েশে মেতে থাকাটাই তাদের কাছে বুদ্ধিমানের কাজ। অথচ তারা জানে না যে, ঈমান ও নামাযের মাঝেই সত্যিকার প্রশান্তি নিহিত রয়েছে। আর তারা যেসব জিনিষের মাঝে শান্তি তালাশ করে, তা মুলত অশান্তিরই উপকরণ। কুফরীর পথে যা হারাম পন্থায় ভোগ করা যায়, ঈমানের পথে তা হালাল উপায়ে উপভোগ করারই ব্যবস্থা আছে। তদুপরি কুফরীর পথে স্বার্থসিদ্ধি করতে গেলে দুনিয়ার জীবনেও চরম মাশুল দিতে হয়, আর ক্ষণস্থায়ী দুনিয়াবি সুখের জন্য আখেরাতের অনন্ত জীবনের জন্যও অকল্পনীয় ভোগান্তি নির্ধারিত হয়। অপরদিকে ঈমানের পথে দুনিয়াবী আকাঙ্ক্ষা যেমন পুরণ হয়, তেমনি আখেরাতের অনন্ত সুখও নিশ্চিত হয়। আল্লাহর অনুমোদিত পন্থায় ভোগ-বিলাস করলে সেজন্য দুনিয়া বা আখেরাতে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ারও সম্মুখীন হতে হয় না, কোন খেসারতও দিতে হয় না। সুতরাং অংকের হিসাবে দেখা যায় যে, এই বাণিজ্যে ঈমানদাররাই বুদ্ধিমানের পরিচয় দিয়েছে, আর কাফের-মুনাফিকরা বোকামির মাঝে নিমজ্জিত থেকে ঈমানদারদেরকেই বোকা জ্ঞান করে নিজেরাই মুলত বোকার স্বর্গে বাস করছে।

বেদ্বীনরা আমাদের দ্বীন নিয়ে যেমন তামাশা করে, তেমনি আমাদের জীবন নিয়েও তামাশা করে। তারা যেমন ইসলামের বিরোধিতা ও ইসলাম নিয়ে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করে, তেমনি মুসলমানদের সাথেও শত্রুতা ও দুর্ব্যবহার করে। কখনো জুলুম-অত্যাচার, কখনো হাসি-ঠাট্টা আবার কখনো বা কটুক্তির মধ্য দিয়ে তাদের ইসলাম ও মুসলিম বিদ্বেষ প্রকাশ পায়। এ সম্পর্কে আল-কুরআনে অন্যত্র বলা হয়েছে, "হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের ছাড়া অন্য কাউকে অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ করো না; তারা তোমাদের অমঙ্গল সাধনে কোন ত্রুটি করে না- তোমরা কষ্টে থাক, তাতেই তাদের আনন্দ। শত্রুতাপ্রসুত বিদ্বেষ তাদের মুখেই ফুটে বেরোয়। আর যা কিছু তাদের মনে লুকিয়ে রয়েছে, তা আরো অনেকগুণ বেশী জঘন্য। তোমাদের জন্য নিদর্শন বিশদভাবে বর্ণনা করে দেয়া হলো, যদি তোমরা তা অনুধাবন করতে সমর্থ হও। দেখ! তোমরাই তাদের ভালবাস, কিন্তু তারা তোমাদের প্রতি মোটেও সদভাব পোষণ করে না। আর তোমরা সমস্ত কিতাবেই বিশ্বাস কর।

অথচ তারা যখন তোমাদের সাথে মিশে, বলে- 'আমরা ঈমান এনেছি।' পক্ষান্তরে তারা যখন পৃথক হয়ে যায়, তখন তোমাদের উপর রোষবশতঃ আঙ্গুল কামড়াতে থাকে। বলুন, তোমরা আক্রোশে মরতে থাক। আল্লাহ মনের কথা ভালই জানেন। তোমাদের যদি কোন মঙ্গল হয়, তাহলে তাদের খারাপ লাগে। আর তোমাদের যদি অমঙ্গল হয়, তাহলে তাতে তারা আনন্দিত হয়। আর যদি তোমরা ধৈর্য্যধারণ কর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর, তবে তাদের প্রতারণায় তোমাদের কোনই ক্ষতি হবে না। নিশ্চয়ই-- তারা যা কিছু করে, সে সমস্তই আল্লাহর আয়ত্তে রয়েছে।" (সুরা আল-ইমরানঃ১১৮-১২০)

তফসীর মাআরেফুল ক্বোরআনে বলা হয়েছে, "উদ্দেশ্য এই যে, ইহুদী হোক কিংবা খৃষ্টান, কপট বিশ্বাসী মুনাফিক হোক কিংবা মুশরিক- কেউ তোমাদের সত্যিকার হিতাকাঙ্ক্ষী নয়। তারা সর্বদাই তোমাদের বোকা বানিয়ে তোমাদের ক্ষতি সাধনে ব্যাপৃত এবং ধর্মীয় ও পার্থিব অনিষ্ট সাধনে সচেষ্ট থাকে। তোমরা কষ্টে থাক এবং কোন না কোন উপায়ে তোমাদের ধর্মীয় ও জাগতিক ক্ষতি হোক, এটাই হল তাদের কাম্য। তাদের অন্তরে যে শত্রুতা লুক্কায়িত রয়েছে, তা খুবই মারাত্মক। কিন্তু মাঝে মাঝে দুর্দমনীয় জিঘাংসায় উত্তেজিত হয়ে এমন সব কথাবার্তা বলে ফেলে, যা তাদের গভীর শত্রুতার পরিচায়ক। শত্রুতা ও প্রতিহিংসায় তাদের মুখ থেকে অসংলগ্ন কথা বের হয়ে পড়ে।" এখন আমরা দেখব ধর্মীয় ও জাগতিক ক্ষতি বলতে কি বুঝায়। ধর্মীয় ব্যাপারে আমাদের সম্পদ হল ঈমান ও চরিত্র। কাজেই এ দুটো জিনিস নষ্ট করাই দুশমনের প্রধান টার্গেট। মুসলমানদের প্রাণে মারতে পারলেও কাফেরদের মনের ঝাল মেটে না। তোমরা জান্নাতে গিয়ে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করবে, এটা তাদের কাছে অধিক অসহ্য। তাই তারা চায় তোমাদের সবাইকে প্রথমে দোযখের উপযোগী করবে, তারপর পরপারে পাঠাবে। সংশ্লিষ্ট সকল মুসলমানের অবগতির জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, এদের সর্বনাশা কুপ্রভাব আর সর্বগ্রাসী নৈতিক আগ্রাসন থেকে নিজে বাঁচুন, সন্তান-সন্ততিকে বাঁচান। আমাদের পার্থিব নেয়ামতের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল জান, মাল ও ইজ্জত। কাজেই শত্রুপক্ষ স্বাভাবিকভাবেই আমাদের প্রাণনাশ করতে চাইবে, মাল-সম্পদ ও ইজ্জত-আব্রু লুটে নেয়ার প্রয়াস চালাবে। এ অনিষ্ট সাধনের প্রয়াস প্রকাশ্যেও হতে পারে, গোপনেও হতে পারে। সরাসরি আঘাত হানার মাধ্যমে হতে পারে; প্ররোচনা দিয়ে, ফাঁদ পেতে বা যাদুটোনার মাধ্যমেও হতে পারে। শত্রুতামূলক তৎপরতা নিজের হাতেও করা যায়, আবার মানুষকে প্ররোচিত করেও করা যায়। এক মুসলমানকে প্রভাবিত করে তার দ্বারা অপর মুসলমানের সর্বনাশ করে। কাউকে ডাকাত দিয়ে সর্বস্বান্ত করে, আবার কাউকে বা পুলিশ দিয়ে হয়রানী করে। কাফের-মুনাফিকরা সাধারণভাবে সকল মুসলমানের সাথেই শত্রুতা ও অনিষ্ট সাধন করে। বিশেষভাবে যারা একটু উপরে উঠতে পারে, তারাই দুশমনের শ্যেনদৃষ্টির শিকার হয়। ঈমান-আমল, ধর্মীয় এলেম, চরিত্র-সতীত্ব, শক্তি-সামর্থ্য, ব্যবসা-বাণিজ্য, মানবসেবা ইত্যাদি যেকোন ক্ষেত্রে কোন মুসলমান ব্যক্তি বা জাতি সামান্য মাথা জাগাতে পারলেই ইসলামবিরোধী শক্তির লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়। শয়তানের টার্গেট হলো তেমাদের হয় বিপথগামী করবে, অথবা প্রাণে মারবে; আর তা না পারলে শারীরিক ও মানসিকভাবে পঙ্গু করে রাখবে, যাতে দ্বীনের কল্যাণে অবদান রাখতে না পার। মুসলমানরা সবাই রুগ্ন ও অকর্মণ্য হয়ে সমাজে লাঞ্ছনা ও অপমানের জীবন যাপন করুক, এটাই কাফেরদের কাম্য। কোন মুসলমানকে ভাতে মারতে গিয়ে যদি নিজেকেও না খেয়ে মরতে হয়, তাও হাসিমুখে মেনে নিতে পারে যেকোন প্রতিহিংসাপরায়ণ কাফের। ইসরাইলের গোয়েন্দা সংস্থার পতিতারা মিশরে এইডস রোগ ফেরি করে বেড়াচ্ছে। যারা আমাদের সর্বনাশ সাধনের জন্য নিজেরা প্রথমে এমন একটি রোগ গ্রহণ করে নিয়েছে, আমাদের প্রতি তাদের প্রতিহিংসা যে কতখানি ভয়াবহ তা কল্পনাও করা যায় না। যারা এইডসের মত প্রাণঘাতী রোগ ছড়ানোর জন্যই নিজেদের এভাবে উৎসর্গ করতে পারে, তাদের কারো পক্ষে সাধারণ রোগব্যাধি ছড়ানোর জন্য এ ধরনের আত্মঘাতী পন্থা অবলম্বন করাটা মোটেই অসম্ভব নয়। নিজে উলঙ্গ হয়েও যদি আমাদের কাউকে খালি গায়ে বানাতে পারে, তা করতেও কোন দ্বিধা নেই। শুনেছি, হামাস নাকি আত্মঘাতী হামলা করে। যুদ্ধক্ষেত্রে নিজের জীবনের বিনিময়ে শত্রু সৈন্য বিনাশ করা অবশ্যই বীরত্বের কাজ। কিন্তু এইডস ছড়ানোর মত এক ঘৃণ্য কাপুরুষোচিত তৎপরতাও সম্মান হিসেবে স্বীকৃতি পেতে পারে, এ কেবল ইহুদী সমাজেই সম্ভব।

কাফেররা মুসলমানদের অকল্যাণ সাধনের চেষ্টা করে যখন ব্যর্থ হয়, তখন রাগের মাথায় তা মুখেই প্রকাশ করে দেয়। কবর দেয়া বা জবাই করার ইচ্ছা মুখ কেবল তখনই প্রকাশ করে, যখন হাত-পা তা বাস্তবায়নের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। হত্যার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলে হত্যার হুমকি দেয়, আর কলুষিত করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলে কলুষতার অপবাদ দেয়। নবী পরিবারের সদস্যরা ইসলামী শরীয়তের বিধি-বিধান কঠোরভাবে মেনে চলার কারণে তাঁরা ছিলেন মুনাফিকদের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। ঈমানদারদের পবিত্র জীবনযাপন ছিল বেঈমানদের জন্য হিংসার কারণ। তারা নিজেদের বিকৃত জীবনধারাকে নবীজীর ঘরেও অনুপ্রবেশ ঘটাতে চেয়েছিল। তাদের সম্পর্কে আয়াত নাযিল হয়, "যারা পছন্দ করে যে, ঈমানদারদের মধ্যে অশ্লীলতা প্রসার লাভ করুক, তাদের জন্যে দুনিয়া ও আখেরাতে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।" (সুরা নুরঃ১৯) এখানে অশ্লীলতা বলতে ব্যভিচার বা ব্যভিচারের অপবাদ দুটোই বোঝানো যায়। অর্থাৎ, মুনাফিকরা চেয়েছিল এমন এক সমাজ যেখানে সবাই নির্লজ্জ কাজ করবে, আর কেউ তা থেকে পবিত্র থাকতে চাইলে সবাই মিলে তাকে অপবাদ দিতে থাকবে। কিন্তু এসব আকাঙ্ক্ষা পুরণে ব্যর্থ হওয়ায় তারা মিথ্যা অপবাদের দ্বারা মনের ঝাল মিটায়। তাদের মুখের কথা ছিল মুলতঃ অন্তরের বাসনারই প্রতিফলন। "যাদের অন্তরে রোগ আছে, তারা কি মনে করে যে, আল্লাহ তাদের অন্তরের বিদ্বেষ প্রকাশ করে দেবেন না? আমি ইচ্ছা করলে আপনাকে তাদের সাথে পরিচিত করে দিতাম। তখন আপনি তাদের চেহারা দেখে চিনতে পারতেন এবং আপনি অবশ্যই কথার ভঙ্গিতে তাদেরকে চিনতে পারবেন। আল্লাহ তোমাদের কার্যসমূহের খবর রাখেন।" (সুরা মুহাম্মাদঃ২৯,৩০) হযরত উসমান (রাঃ) বলেন, "যে ব্যক্তি কোন বিষয় অন্তরে গোপন করে, আল্লাহ তাআলা তার চেহারা ও অনিচ্ছাপ্রসূত কথা দ্বারা তা প্রকাশ করে দেন।" আমরা আরও জানতে পারলাম যে, তাদের মুখ নিসৃত ঘৃণা-বিদ্বেষের তুলনায় অন্তরে লুক্কায়িত জিঘাংসা অনেক বেশী। অর্থাৎ, তারা মুখে যে পরিমাণ ক্ষতি করার হুমকি দেয়, বাস্তবে তার চেয়ে অধিক ক্ষতি করার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে। যেসব শব্দ বলে পালি দেয়, আমাদেরকে তার চেয়ে অধিক নিকৃষ্ট চরিত্রের অধিকারী বানাতে চায়। কেউ যদি বিনা কারণে তোমাকে বিশেষ বিশেষ অশ্লীল বিশেষণে ভূষিত করে, তাহলে বুঝতে হবে সে আসলে মনেপ্রাণেই তোমাকে লম্পট হিসেবে দেখতে চায়--- তোমার দ্বারা মুসলিম মা-বোনদের বারোটা বাজাতে চায়। কিন্তু তোমার মাঝে তাওহীদের বীজ দেখে যখন সে বুঝতে পারে যে, তোমার দ্বারা তার মনের দিবাস্বপ্ন পুরণ হওয়া সম্ভব নয়, তখনই সে সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে তোমার উপর। অবশ্য স্থান, কাল ও পাত্রভেদে শত্রুতার মাত্রাও কম-বেশী হতে পারে। মুখের ভাষা তথা হুমকি ও পালিপালাজের ধরন

BLACK ICE
SOFTWARE INC.
Driver Demo

দেখে মনের শত্রুতার তারতম্য পরিমাপ করা যায়। আমরা জানি মুনাফিক মানেই মুখে মধু অন্তরে বিষ। কিন্তু অন্তরের বিষ যখন এতই উপচে পড়ে যে মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে, তখন বুঝতে হবে গোটা অন্তর নিশ্চয়ই বিষে কানায় কানায় পরিপূর্ণ।

"দেখ! তোমরাই তাদের ভালবাস, কিন্তু তারা তোমাদের প্রতি মোটেও সদভাব পোষণ করে না।" এ আয়াতাংশে কাফেরদের প্রতি মুসলমানদের একতরফা প্রেমের চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। একদিকে আমরা ভালবাসার খাতিরে তাদের বড় বড় অপরাধী জালেমকে ছেড়ে দেই, অপরদিকে তারা আমাদের নিরপরাধ শিশুদের জন্য মৃত্যুদণ্ড স্থির করতেও এতটুকু কুণ্ঠিত হয় না। মুসলিম দেশের মুসলিম জনগণ মুনাফিকদের ভালবেসে ভোট দিয়ে ক্ষমতায় বসায়, তারপর সেই মুনাফিকরা বিদেশী কাফেরদের সাথে চুক্তি করে দেশের মানুষকে পানিতে ডুবিয়ে মারার ব্যবস্থা করে। যারা আমাদের অমঙ্গল সাধনের প্রচেষ্টায় কোন ত্রুটি করে না, তারাই আবার ছলে-বলে-কৌশলে আমাদের মাঝে জনপ্রিয়তার শীর্ষে আরোহন করে। কসোভোতে যারা বোমা নিক্ষেপে মুসলমানদের পুড়িয়ে মারল, তাদেরকেই মুসলমানরা ফুলের তোড়া দিয়ে স্বাগত জানায়। আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় তফসীর মাআরেফুল কোরআনে বলা হয়েছে, "অর্থাৎ- এটা কেমন বেখাপ্পা বিষয় যে, তোমরা তাদের সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তুলবে, অথচ তারা তোমাদের বন্ধু নয়; বরং মুলোৎপাটনকারী শত্রু! আশ্চর্যের বিষয় তোমরা সব খোদায়ী গ্রন্থে বিশ্বাসী; তা যে কোন জাতি, যে কোন যুগে, যে কোন পয়গম্বরের প্রতি অবতীর্ণ হোক না কেন; কিন্তু এর বিপরীতে তারা তোমাদের পয়গম্বর ও গ্রন্থ কোরআনকে বিশ্বাস করে না। এমন কি তাদের নিজ গ্রন্থের প্রতিও তাদের শুদ্ধ বিশ্বাস নেই। এদিক দিয়ে তোমাদের সাথে ওদের অল্পবিস্তর বন্ধুত্ব এবং তাদের প্রতি তোমাদের বিদ্বেষভাব থাকা উচিত ছিল, কিন্তু এখানে ব্যাপার হচ্ছে উল্টো।" আমার মতে, এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে দুটো; এক. ইহুদী-খ্রীস্টানদের বন্ধুত্ব নিষিদ্ধ করা এবং দুই. উভয়ের আচরণের তুলনামুলক আলোচনার মাধ্যমে শত্রুপক্ষের অকৃতজ্ঞতাকে ফুটিয়ে তোলা। তবে কিতাবে বিশ্বাসের ক্ষেত্রে কোন আসমানী কিতাবকে অবিশ্বাস করতে বলা উদ্দেশ্য নয়, বরং ইহুদী-খ্রীস্টানদের ভণ্ডামীকে তুলে ধরাই উদ্দেশ্য। এছাড়া স্বভাবের উদারতা ও চারিত্রিক পবিত্রতার দিক দিয়েও মুসলমানরা বিধর্মীদের তুলনায় অধিক শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। অথচ মুসলমানরা তাদের ঘৃণা করে না, বরং তারাই মুসলমানদের ঘৃণা করে। কসোভোতে মার্কিন সৈন্যের হাতে মুসলিম বালিকার পাশবিক নির্যাতনে মৃত্যু ঘটার পরেও মুসলিম শিশুরা মার্কিন সৈন্যদের সাথে খেলাধুলা করে। যেখানে নিষ্পাপদের পক্ষে পাপিষ্ঠদের ঘৃণা করাই স্বাভাবিক ছিল, সেখানে তারাই ঘৃণার শিকার হচ্ছে, আর ভালবাসা বিলিয়ে যাচ্ছে। কোন অমুসলিমকে সালাম দেয়া হলে সে খুশী হওয়ার পরিবর্তে বরং অখুশীই হবে, কারণ সালাম দেয়া সম্পূর্ণ ইসলামী কালচারের অংশ। অনুরূপভাবে, ভালবাসা ও ভক্তি-শ্রদ্ধা যেহেতু ইসলামী আখলাকের অংশ, কাজেই এসবের দ্বারা কাফেরদের কাছে কোন ইতিবাচক প্রতিদান আশা করা যায় না।

এখানে উদ্ধৃত সুরা আল-ইমরানের শেষোক্ত আয়াতের শুরুতে বলা হয়েছে যে, তোমাদের যদি কোন মঙ্গল হয়, তাহলে তাদের খারাপ লাগে। আর তোমাদের যদি অমঙ্গল হয়, তাহলে তাতে তারা আনন্দিত হয়। মুমিনদের প্রতি মুনাফিকদের পরশ্রীকাতর মনোভাব সম্পর্কে অন্যত্র বলা হয়েছে, "তাদের অন্তকরণ ব্যাধিগ্রস্ত আর আল্লাহ তাদের ব্যাধি আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন। বস্তুতঃ তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে ভয়াবহ আযাব, তাদের মিথ্যাচারের দরুন।" (সুরা বাকারাঃ১০) মুসলমানদের ঈমানের উন্নতি, চারিত্রিক পবিত্রতা, ধন-সম্পদ, পারিবারিক শান্তি সবই মুনাফিকের জন্য হিংসার কারণ। আল্লাহ মুলতঃ এই কারণগুলোকে বৃদ্ধি করার মাধ্যমেই শত্রুকে হিংসার আগুনে জ্বলে-পুড়ে মরার সুযোগ করে দেন। মুসলিম জনগণ মুসলিম সরকারের অধীনে শান্তিতে ধর্মকর্ম পালন করবে, দ্বীন-ঈমান সহকারে জীবনযাপন করবে, এটা তাদের কাছে এতই সহ্যাতীত ব্যাপার যে, গোটা দেশটাই তাদের কাছে দোজখখানা মনে হয়। এমতাবস্থায় যদি দেশে-বিদেশে কারো কাছে বলে কয়ে মুসলমান দেশবাসীর উপর গণহত্যা চালানোর ব্যবস্থা করে তাদের এ শান্তিকে বরবাদ করা যায়, তবেই দেশটা তাদের জন্য বেহেশতের বাগিচায় পরিণত হবে। তারা আমাদের সুখ দেখলে যেমন ব্যথিত হয়, তেমনি দুঃখ-কষ্ট দেখলেও আনন্দে উদ্বেলিত হয়। মুসলমানরা ঘরে বসে মৃত্যু, অসুস্থতা বা জখমের শিকার হলে, প্রবাসে শত্রুর হাতে শহীদ হলে বা ডাকাতের কবলে পড়ে ফতুর হলে মুনাফিকরা যারপরনাই আনন্দিত হয়। তারা এই আনন্দের কথাও চেপে রাখতে পারে না। খুশীতে আত্মহারা হয়ে হাসি-তামাশার মাধ্যমে মনের কথা প্রকাশ করে দেয়। বিশেষ করে মুসলমানরা যখন জাতীয়ভাবে কোন দুর্যোগের শিকার হয়, তখন মুনাফিকদের খুশীর সীমা থাকে না। তারা তখন সেই বিপদের ফজীলত বয়ান করতে শুরু করে। তারা বলে, বন্যায় জমির উর্বরতা বাড়লে আরো অধিক ফসল হবে। মানুষের জীবন নিয়ে কী নিষ্ঠুর তামাশা! এরাই তারা, যারা জনগণের সামনে চমকপ্রদ কথা বলে, আর পিছনে গিয়ে শস্যক্ষেত্র ধ্বংসের অপপ্রয়াস চালায়। (সুরা বাকারার ২০৪, ২০৫ আয়াত দ্রষ্টব্য) পরিশেষে আল্লাহ আমাদের নিশ্চয়তা দিয়েছেন যে, ধৈর্য্য ও তাকওয়ার দ্বারাই দুশমনের চক্রান্ত থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব। এখানে ধৈর্য্যধারণ বলতে মুখ বুজে অত্যাচার সহ্য করা বুঝায় না, বরং ধৈর্যের সাথে পরিস্থিতি মোকাবেলা করা বুঝায়। তাকওয়া তথা আত্মশুদ্ধি সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, "হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজেদের চিন্তা কর। তোমরা যখন সৎপথে রয়েছ, তখন কেউ পথভ্রান্ত হলে তাতে তোমাদের কোন ক্ষতি নেই।" (মায়েদা) অর্থাৎ, আমরা যদি আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে তাকওয়া অর্জন করে ঈমানদার ও চরিত্রবান হতে পারি, তাহলে বিপথগামীরা কেউ আমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

পরিশেষে আমরা বলতে চাই, কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব, সমঝোতা, শান্তিচুক্তি কিংবা আপোষ-মীমাংসার দ্বারা বড়জোর নিজের কিছু ব্যক্তিগত সাময়িক বৈষয়িক ফায়দা হতে পারে, কিন্তু ইসলাম ও মুসলমানদের সামগ্রিক কল্যাণ কিছুতেই অর্জিত হতে পারে না।

সাপ্তাহিক মুসলিম জাহান (১--৭ মার্চ, ৮--১৪ মার্চ, ২৯ মার্চ--৪ এপ্রিল, ৫--১১ এপ্রিল, ২৬ এপ্রিল--১ মে, ৩ মে--৯মে, ১৭--২৩ মে; ২০০০)

বর্তমানে ঈষৎ পরিবর্তিত